3763

~~258~~

~~Senior~~

বঙ্কিম রচনাবলী

রাধারাণী ও যুগলাঙ্গুরীয়

ভূমিকা
কবিশেখর কালিদাস রায়

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী
ক লি কা তা

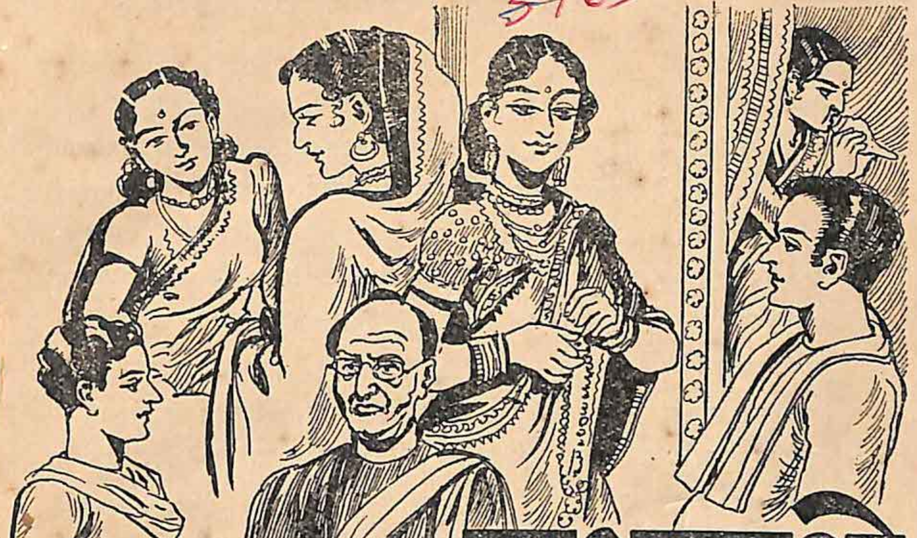
ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী
৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

প্রথম সংস্করণ
যুগলাঙ্গুরীয়—১৮৭৪
রাধারাণী — ১৮৭৫

বিশেষ সংস্করণ
১৩৫৬

: চিত্রশিল্পী :
শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

কলিকাতা ৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট হইতে শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও
১৫এ, ক্ষুদিরাম বোস রোড, সাধারণ প্রেস লিঃ হইতে শ্রীধনঞ্জয় প্রামাণিক কর্ত্তৃক মুদ্রিত



রাধারাণী



ভূমিকা

যুগলাঙ্গুরীয়কে আমি বাংলার ছোটগল্পের অভ্যুদয়ের শুকতারা বলিয়াছি—রাধারাণীতেই বাংলার ছোটগল্পের সূত্রপাত হইয়াছে বলিতে পারা যায়। ইহা অঙ্কুর মাত্র—অঙ্কুরে বৃক্ষলতার ভবিষ্য-জীবনের সমস্ত অঙ্গই প্রচ্ছন্ন থাকে, কোনটিই সুপ্রকট থাকে না। রাধারাণীতেও ছোট গল্পের সকল অঙ্গেরই পূর্ব্বাভাষ আছে—কোনটি সুপ্রকট হয় নাই।

ছোটগল্প রচিত হয় সাধারণতঃ ছোটখাটো মানুষের ছোটখাটো সুখ-দুঃখ লইয়া এবং সমাপ্ত হয় ছোট খাটো পরিসরের মধ্যেই। বঙ্কিমচন্দ্র ছোট

সংসারের একটি ছোট মেয়েকে আশ্রয় করিয়াই গল্পটি আরম্ভ করিয়াছিলেন—কিন্তু ছোটগল্প রচনার অনুকূল মনোভূমি বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল না। সেজন্য কাঙ্গালিনী রাধারাণীকে তিনি অল্প পরিসরের মধ্যেই রাজরাণী বানাইয়া পরিতৃপ্ত হইলেন। ছোটগল্পের প্রধান লক্ষণ বাস্তবনিষ্ঠতা। রাধারাণীতে বাস্তব-নিষ্ঠতার চেষ্টা আছে। তবে বাস্তব-নিষ্ঠতার একটা প্রধান ধর্ম্ম সর্ব্ববিষয়ে আতিশয্য বর্জ্জন। বঙ্কিম রাধারাণীতে উপকথাসুলভ আতিশয্য বর্জ্জন করিতে পারেন নাই। ধনসম্পদেও আতিশয্য, দারিদ্র্যেও আতিশয্য, করুণাতেও আতিশয্য, কৃতজ্ঞতাতেও আতিশয্য, লাভেও আতিশয্য, ক্ষতিতেও আতিশয্য,—সর্ব্ব ব্যাপারেই আতিশয্য। আতিশয্য বর্জ্জিত হইলে রাধারাণী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ছোট গল্পই হইতে পারিত।

গীতিকবিতার মত ছোটগল্পের মূল প্রেরণা থাকে কোন একটি সুকুমার হৃদয়বৃত্তি বা গভীর মনোবেগ। রাধারাণীতে তাহা আছে। রাজা দেবেন্দ্র-নারায়ণ বা রুক্মিণীকুমারের পক্ষ হইতে করুণা—রাধারাণীর পক্ষ হইতে কৃতজ্ঞতাই এই গল্পের মূল প্রেরণা। Pity melteth into love. দেবেন্দ্রের এই করুণা অনুরাগে পরিণত হইল। অনুকূল উর্ব্বর মনোভূমি পাইয়া করুণার বীজ বাহির হইতে কোন সহায়তা না পাইয়াও অনুরাগের মহীরুহে পরিণত হইল। আর কৃতজ্ঞতার বীজও বাহির হইতে কোন পুষ্টিরস না পাইয়াও রাধারাণীর নবোদ্ভিদ্যমান যৌবনের স্বাভাবিক রসে অনুরাগবল্লীতে পরিণত হইল। ইহাতে অস্বাভাবিকতা কিছু নাই। কিন্তু দেবেন্দ্র নারায়ণ অন্ধকারে রাধারাণীর চেহারাটাও দেখেন নাই, তাহার বয়স তখন মাত্র এগারো, যৌবনের স্পর্শও তখন সে লাভ করে নাই, দেবেন্দ্র নারায়ণ কেবল তাহার শিশুসারল্যের পরিচয় পাইলেন—আর তাঁহার সম্বল থাকিয়া গেল অতিমধুর একটা কণ্ঠস্বরের স্মৃতি মাত্র। আর রাধারাণীও দেবেন্দ্রনারায়ণকে দেখেন নাই অন্ধকারে। তাঁহার বয়স কত তাহাও জানেন নাই, কি জাতির লোক তিনি তাহাও জানিলেন না—দুঃসময়ে দেবতার কৃপার মত তাঁহার করুণা হইল তাহার অকূল পাথারে ভেলার মত। রাধারাণীর হৃদয়ে দেবেন্দ্র চিরদিনের জন্য দেবতারই আসন দখল করিয়া রহিলেন। এই ব্যাপারে যে অবাস্তবতা আছে, তাহাতে রাধারাণীর গল্প উপকথার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে।

উপকথায় নায়ক-নায়িকার মিলনে অনেক বাধা থাকে, সে বাধা জয় করিতে হয় নায়কের পৌরুষ বলে ; কিন্তু সমস্যা কিছু থাকে না।

রাধারাণীতে বঙ্কিম রীতিমত সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছেন। রাধারাণী তাঁহার কল্পিত দেবতাকে মনে মনে দেহমন সমর্পণ করিয়া ফেলিলেন—তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে কিনা ঠিক নাই—তিনি কোন জাতি বা কোন সমাজের লোক তাহার ঠিক নাই, তিনি বিবাহিত কিনা তাহারও ঠিক নাই, অবিবাহিত হইলেও তিনি তাহাকে ভালবাসিয়া গ্রহণ করিবেন কিনা তাহারও স্থিরতা নাই। তাঁহার জন্য চিরজীবন প্রতীক্ষা করাই চলে—তাঁহাকে পাওয়া প্রায় অসম্ভব। ইহাই রাধারাণীর জীবনের সমস্যা। বঙ্কিমচন্দ্র দৈবের সাহায্যে এই সমস্যার সমাধান করিয়াছেন। দৈবকে আহ্বান না করিলে এই সমস্যা একখানি উপন্যাসে পরিণত হইতে পারিত। রাধারাণী পড়িয়া তাই মনে হয়, ইহা একখানি বৃহৎ উপন্যাসের ভিত্তি। তেতালা বাড়ীর ভিত্তি গাঁথিয়া শেষে লোকে আকস্মিক অর্থাভাবে যেমন খানিকদূর দেওয়াল তুলিয়া খড় কিংবা টিন দিয়া ছাউনি করিয়া সমাপ্ত করিতে বাধ্য হয়—বঙ্কিমচন্দ্র যেন তেমনি কোন কারণে এই কাহিনীটিকে দৈবের সাহায্যে সমাপ্ত করিয়াছেন। ইহা উপন্যাসের সম্ভাব্যতা লইয়া একটি ছোট গল্পে পরিণত হইয়াছে।

গল্পের সবচেয়ে মধুর ও সুন্দর অংশ দেবেন্দ্রনারায়ণ ও রাধারাণীর দ্বিতীয় সাক্ষাৎকারে বাগ্‌বিনিময়। এই বাগ্‌বিনিময়ে যে মনোভাবের লুকোচুরির খেলা ও বক্রোক্তিলীলা আছে তাহা বঙ্কিমের নিজস্ব রচনা-চাতুর্য্যের প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

প্রণয়লীলাকে অবলম্বন করিয়া এই রঙ্গ-রসিকতা ও অবহিত্থার কলাচাতুর্য্য তাঁহার অন্যান্য উপন্যাসেও বর্ত্তমান। বিশেষ করিয়া এক্ষেত্রে ইন্দিরার নাম করা যাইতে পারে।

হাকিম বঙ্কিমচন্দ্রের নিজস্ব একটা সওয়াল-জবাবের ঢঙ আছে—ইহা সত্যে পৌছিবার অতিমন্থর অথচ সরস শোভা-ভঙ্গী। রাধারাণীর এই অংশে তাহা চমৎকার রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলির দুর্ভাগ্যের পথটা অতিদ্রুত পদসঞ্চারে অতিক্রম করেন—সৌভাগ্যের পথটা অতিক্রম করেন মন্থর গতিতে।

বঙ্কিমের বিশাল পুষ্পোদ্যানে রাধারাণী যূথীর মত এক কোণে বিকশিত—কিন্তু ইহার সৌরভে কে না আকৃষ্ট হইবে?

শ্রীকালিদাস রায়

সুহৃদ্বরেষু —

আপনার প্রণয়োপহার স্বরূপ
পুস্তক দুইখানি পাইয়াছি ও পড়িয়া
খুসি হইয়াছি। পীড়া প্রযুক্ত এত
দিন পুস্তক প্রাপ্তির সম্বাদ ও পত্রের
উত্তর লিখিতে পারি নাই। অপরাধ
মার্জ্জনা করিবেন।

কমলাকান্তের দ্বিতীয় সংস্করণ
প্রকাশিত আপনার নিকট পাঠাইবার
কলিকাতায় আমার কার্য্যকারকে
লিখিয়াছি।

ভরসা করি আপনার শারীরিক মঙ্গল।
ইতি ২ অগ্রহায়ণ

শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[বঙ্কিমচন্দ্রের বাংলা হাতের লেখা]

No. 82.

From Baboo Bunkim Chunder Chatterjea
Deputy Collector of Nugwan

To

F. R. Cockerell Esquire
Offg Collector of Midnapore

Dated Nugwan the 9th February 1860

Sir,

I have the honor to report that I have this day taken charge of the Nugwan Office. The amount of Cash balance in hand is Rs. a P. 5 .. 2½.-

I have the honor to be
Sir
Your Most Obed't servant
Bunkim Ch Chatterjee
Deputy Collector

[বঙ্কিমচন্দ্রের ইংরেজী হাতের লেখা]

রাধারাণী

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাধারাণী নামে এক বালিকা মাহেশে রথ দেখিতে গিয়াছিল। বালিকার বয়স একাদশ পরিপূর্ণ হয় নাই। তাহাদিগের অবস্থা পূর্ব্বে ভাল ছিল—বড়মানুষের মেয়ে। কিন্তু তাহার পিতা নাই। তাহার মাতার সঙ্গে একজন জ্ঞাতির একটি মোকদ্দমা হয়, সর্ব্বস্ব লইয়া মোকদ্দমা ; মোকদ্দমাটি বিধবা হাইকোর্টে হারিল। সে হারিবামাত্র, ডিক্রীদার জ্ঞাতি ডিক্রী জারি করিয়া ভদ্রাসন হইতে উহাদিগকে বাহির করিয়া দিল। প্রায় দশ লক্ষ টাকার সম্পত্তি ডিক্রী জারি করিয়া লইল। খরচ ও ওয়াশিলাত দিতে নগদ যাহা কিছু ছিল, তাহাও গেল। রাধারাণীর মাতা অলঙ্কারাদি বিক্রয় করিয়া প্রিবিকৌন্সিলে একটি আপীল করিল। কিন্তু আর আহারের সংস্থান রহিল না। বিধবা একটি কুটীরে আশ্রয় লইয়া কোন প্রকারে শারীরিক পরিশ্রম করিয়া দিনপাত করিতে লাগিল। রাধারাণীর বিবাহ দিতে পারিল না।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে রথের পূর্ব্বে রাধারাণীর মা ঘোরতর পীড়িত হইল—যে কায়িক পরিশ্রমে দিনপাত হইত, তাহা বন্ধ হইল। সুতরাং আর আহার চলে না। মাতা রুগ্না, এ জন্য কাজে-কাজেই তাহার উপবাস। রাধারাণীর জুটিল না বলিয়া উপবাস। রথের দিন তাহার মা একটু বিশেষ হইল, পথ্যের প্রয়োজন হইল ; কিন্তু পথ্য কোথায় ? কি দিবে ?

রাধারাণী কাঁদিতে কাঁদিতে কতকগুলি বনফুল তুলিয়া তাহার মালা গাঁথিল। মনে করিল যে, এই মালা রথের হাটে বিক্রয় করিয়া দুই একটি পয়সা পাইব, তাহাতেই মা'র পথ্য হইবে।

কিন্তু রথের টান অর্দ্ধেক হইতে না হইতেই ঝড়-বৃষ্টি আরম্ভ হইল। বৃষ্টি দেখিয়া লোক ভাঙ্গিয়া গেল। মালা কেহ কিনিল না। রাধারাণী মনে করিল যে, আমি একটু না হয় ভিজিলাম—বৃষ্টি থামিলেই আবার লোক জমিবে।

কিন্তু বৃষ্টি আর থামিল না। লোক আর জমিল না। সন্ধ্যা হইল—রাত্রি হইল—বড় অন্ধকার হইল, অগত্যা রাধারাণী কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিল।

অন্ধকার—পথ কর্দ্দমময়,—পিচ্ছিল—কিছু দেখা যায় না। তাহাতে মুষলধারে শ্রাবণের ধারা বর্ষিতেছিল। মাতার অন্নাভাব মনে করিয়া তদপেক্ষাও রাধারাণীর চক্ষু বারিবর্ষণ করিতেছিল। রাধারাণী কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিতেছিল, আবার কাঁদিতে কাঁদিতে আছাড় খাইতেছিল। দুই গণ্ড-বিলম্বী ঘন কৃষ্ণ অলকাবলী বহিয়া, কবরী বহিয়া, বৃষ্টির জল পড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছিল। তথাপি রাধারাণী সেই এক পয়সার বনফুলের মালা বুকে করিয়া রাখিয়াছিল—ফেলে নাই।

এমন অন্ধকারে অকস্মাৎ কে আসিয়া রাধারাণীর ঘাড়ের উপর পড়িল। রাধারাণী এতক্ষণ উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া কাঁদে নাই—এতক্ষণে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিল।

যে ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল, সে বলিল, "কে গা তুমি কাঁদ ?"

পুরুষমানুষের গলা—কিন্তু কণ্ঠস্বর শুনিয়া রাধারাণীর রোদন বন্ধ হইল। রাধারাণীর চেনা লোক নহে—কিন্তু বড় দয়ালু লোকের কথা—রাধারাণীর ক্ষুদ্রবুদ্ধিটুকুতে ইহা বুঝিতে পারিল। রাধারাণী রোদন বন্ধ করিয়া বলিল, "আমি দুঃখী লোকের মেয়ে। আমার কেহ নাই—কেবল মা আছেন।"

সে পুরুষ বলিল, "তুমি কোথায় গিয়াছিলে ?"

রাধা। আমি রথ দেখিতে গিয়াছিলাম। বাড়ী যাইব। অন্ধকারে বৃষ্টিতে পথ দেখিতে পাইতেছি না।

পুরুষ বলিল, "তোমার বাড়ী কোথায় ?"

রাধারাণী বলিল, "শ্রীরামপুর।"

সে ব্যক্তি বলিল, "আমার সঙ্গে আইস—আমিও শ্রীরামপুর যাইব। চল, কোন্ পাড়ায় তোমার বাড়ী—তাহা আমাকে বলিয়া দাও—আমি তোমাকে বাড়ী রাখিয়া আসিতেছি। বড় পিছল, তুমি আমার হাত ধর, নইলে পড়িয়া যাইবে।"

এইরূপে সেই ব্যক্তি রাধারাণীকে লইয়া চলিল। অন্ধকারে সে রাধারাণীর বয়স অনুমান করিতে পারে নাই, কিন্তু কথার স্বরে বুঝিয়াছিল যে, রাধারাণী বড় বালিকা। এখন রাধারাণী তাহার হাত ধরায় হস্তস্পর্শে জানিল, রাধারাণী বড় বালিকা। তখন সে জিজ্ঞাসা করিল যে, "তোমার বয়স কত ?"

রাধা। দশ এগার বছর—

"তোমার নাম কি ?"

রাধা। রাধারাণী।

"হাঁ রাধারাণি! তুমি ছেলেমানুষ, একলা রথ দেখতে গিয়েছিলে কেন ?"

তখন সে কথায় কথায় মিষ্ট মিষ্ট কথাগুলি বলিয়া, সেই এক পয়সার বনফুলের মালার সকল কথাই বাহির করিয়া লইল। শুনিল যে, মাতার পথ্যের জন্য বালিকা এই মালা গাঁথিয়া রথহাটে বেচিতে গিয়াছিল—রথ দেখিতে যায় নাই—সে মালাও বিক্রয় হয় নাই—এক্ষণেও বালিকার হৃদয়-মধ্যে লুক্কায়িত আছে। তখন সে বলিল, "আমি একছড়া মালা খুজিতেছিলাম। আমাদের বাড়ী ঠাকুর আছেন, তাঁহাকে পরাইব। রথের হাট শীঘ্র ভাঙ্গিয়া গেল—আমি তাই মালা কিনিতে পারি নাই। তুমি মালা বেচ ত আমি কিনি।"

রাধারাণীর আনন্দ হইল, কিন্তু ভাবিল যে, আমাকে যে এত যত্ন করিয়া, হাত ধরিয়া, এ অন্ধকারে বাড়ী লইয়া যাইতেছে, তাহার কাছে দাম লইব কি প্রকারে ? তা নহিলে আমার মা খেতে পাবে না।—তা নিই।

এই ভাবিয়া রাধারাণী মালা সমভিব্যাহারীকে দিল। সমভিব্যাহারী বলিল, "ইহার দাম চারি পয়সা—এই লও।" সমভিব্যাহারী এই বলিয়া মূল্য দিল। রাধারাণী বলিল, "এ কি পয়সা ? এ যে বড় বড় ঠেকছে।"

"ডবল পয়সা—দেখিতেছ না, দুইটা বৈ দিই নাই।"

রাধা। তা এ যে অন্ধকারেও চক্‌চক্ করছে। তুমি ভুলে টাকা দাও নাই ত ?

"না। নূতন কলের পয়সা, তাই চক্‌চক্ করছে।"

রাধা। তা আচ্ছা, ঘরে গিয়ে প্রদীপ জ্বেলে যদি দেখি যে পয়সা নয়, তখন ফিরাইয়া দিব। তোমাকে সেখানে একটু দাঁড়াইতে হইবে।

কিছু পরে তাহারা রাধারাণীর মার কুটীরদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে গিয়া রাধারাণী বলিল, "তুমি ঘরে আসিয়া দাঁড়াও, আমরা আলো জ্বালিয়া দেখি টাকা কি পয়সা।"

সঙ্গী বলিল, "আমি বাহিরে দাঁড়াইয়া আছি, তুমি ভিজা কাপড় ছাড়—তারপর প্রদীপ জ্বালিও।"

রাধারাণী বলিল, "আমার আর কাপড় নাই—একখানি ছিল, তাহা কাচিতে দিয়াছি। তা আমি ভিজা কাপড়ে সর্ব্বদা থাকি, আমার ব্যামো হয় না। আঁচলটা নিংড়ে পরিব এখন। তুমি দাঁড়াও, আমি আলো জ্বালি।"

"আচ্ছা।"

ঘরে তৈল ছিল না, সুতরাং চালের খড় পাড়িয়া চকমকি ঠুকিয়া আগুন জ্বালিতে হইল। আগুন জ্বালিতে কাজে কাজেই একটু বিলম্ব হইল। আলো জ্বালিয়া রাধারাণী দেখিল, টাকা বটে, পয়সা নহে।

তখন রাধারাণী বাহিরে আসিয়া আলো ধরিয়া তল্লাস করিয়া দেখিল যে, যে টাকা দিয়াছে, সে নাই, চলিয়া গিয়াছে।

রাধারাণী তখন বিষণ্ণ-বদনে সকল কথা তাহার মাকে বলিয়া মুখপানে চাহিয়া রহিল—সকাতরে বলিল—"মা,—এখন কি হবে?"

মা বলিল, "কি হবে বাছা! সে কি আর না জেনে টাকা দিয়েছে? সে দাতা, আমাদের দুঃখ শুনিয়া দান করিয়াছে—আমরাও ভিখারী হইয়াছি, দান গ্রহণ করিয়া খরচ করি।"

তাহারা এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতেছিল, এমন সময়ে কে আসিয়া তাহাদের কুটীরের আগড় ঠেলিয়া বড় সোরগোল উপস্থিত করিল। রাধারাণী দ্বার খুলিয়া দিল; মনে করিয়াছিল যে, সেই তিনিই বুঝি আবার ফিরিয়া আসিয়াছেন। পোড়া কপাল! তিনি কেন? পোড়ারমুখো কাপুড়ে মিন্‌ষে।

রাধারাণীর মা'র কুটীর বাজারের অনতিদূরে। তাহাদের কুটীরের নিকটেই পদ্মলোচন সাহার কাপড়ের দোকান। পদ্মলোচন খোদ,—পোড়ার মুখো কাপুড়ে মিন্‌ষে—একজোড়া নূতন কুঞ্জদার শান্তিপুরে কাপড় হাতে করিয়া আনিয়াছিল, এখন দ্বার খোলা পাইয়া তাহা রাধারাণীকে দিল, বলিল, "রাধারাণীর এই কাপড়।"

রাধারাণী বলিল, "ও মা, আমার কিসের কাপড়?"

পদ্মলোচন—সে বাস্তবিক পোড়ারমুখো কি না, তাহা আমরা সবিশেষ জানি না—রাধারাণীর কথা শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইল; বলিল, "কেন, এই যে এক বাবু এখনই আমাকে নগদ দাম দিয়া বলিয়া গেল যে, এই কাপড় এখনই ঐ রাধারাণীকে দিয়া এস।"

রাধারাণী তখন বলিল, "ও মা, সেই গো! সেই তিনিই কাপড় কিনে পাঠিয়ে দিয়েছেন। হ্যাঁ গো পদ্মলোচন—"

রাধারাণীর পিতার সময় হইতে পদ্মলোচন ইহাদের কাছে সুপরিচিত—অনেকবারই ইহাদিগের নিকট, যখন সুদিন ছিল, তখন চারি টাকার কাপড় শপথ করিয়া আট টাকা সাড়ে বারো আনা, আর দুই আনা মুনফা লইতেন।

"হ্যাঁ পদ্মলোচন—বলি, সে বাবুটিকে চেন ?"

পদ্মলোচন বলিল, "তোমরা চেন না ?"

রাধা। না।

পদ্ম। আমি বলি, তোমাদের কুটুম্ব। আমি চিনি না।

যাহা হউক, পদ্মলোচন চারি টাকার কাপড় আবার যায় মুনফা আট টাকা সাড়ে চৌদ্দ আনায় বিক্রয় করিয়াছেন, আর অধিক কথা কহিবার প্রয়োজন নাই বিবেচনা করিয়া প্রসন্নমনে দোকানে ফিরিয়া গেলেন।

এদিকে রাধারাণী প্রাপ্ত টাকা ভাঙ্গাইয়া মা'র পথ্যের উদ্যোগের জন্য বাজারে গেল। বাজার করিয়া তেল আনিয়া প্রদীপ জ্বালিল। মা'র জন্য যৎকিঞ্চিৎ রন্ধন করিল। স্থান পরিষ্কার করিয়া, মাকে অন্ন দিবে, এই অভিপ্রায়ে ঘর ঝাঁটাইতে লাগিল। ঝাঁটাইতে একখানা কাগজ কুড়াইয়া পাইল—হাতে করিয়া তুলিল, "এ কি মা!"

মা দেখিয়া বলিলেন—"একখানা নোট।"

রাধারাণী বলিল,—"তবে তিনি ফেলিয়া গিয়াছেন।"

মা বলিলেন, "হাঁ! তোমাকে দিয়া গিয়াছেন। দেখ, তোমার নাম লেখা আছে।"

রাধারাণী বড়ঘরের মেয়ে, একটু অক্ষরপরিচয় ছিল। সে পড়িয়া দেখিল, তাই বটে! লেখা আছে।

রাধারাণী বলিল, "হাঁ মা, এমন লোক কে মা ?"

মা বলিলেন, "তাঁহার নামও নোটে লেখা আছে। পাছে কেহ চোরা নোট বলে, এইজন্য নাম লিখিয়া দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নাম রুক্মিণীকুমার রায়।"

পরদিন মাতায় কন্যায় রুক্মিণীকুমার রায়ের অনেক সন্ধান করিল। কিন্তু শ্রীরামপুরে বা নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে রুক্মিণীকুমার রায় কেহ আছে, এমত কোন সন্ধান পাইল না। নোটখানি তাহারা ভাঙ্গাইল না—তুলিয়া রাখিল—তাহারা দরিদ্র, কিন্তু লোভী নহে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাধারাণীর মাতা পথ্য করিলেন বটে, কিন্তু সে রোগ হইতে মুক্তি পাওয়া তাঁহার অদৃষ্টে ছিল না। তিনি অতিশয় ধনবতী ছিলেন, এখন অতি দুঃখিনী

হইয়াছিলেন, এই শারীরিক এবং মানসিক দ্বিবিধ কষ্ট তাঁহার সহ্য হইল না। রোগ ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া তাঁহার শেষকাল উপস্থিত হইল।

এমত সময়ে বিলাত হইতে সংবাদ আসিল যে, প্রিবিকৌন্সিলের আপীল তাঁহার পক্ষে নিষ্পত্তি হইয়াছে, তিনি আপন সম্পত্তি পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন, ওয়াশিলাতের টাকা ফেরত পাইবেন এবং আদালতের খরচ পাইবেন। কামাখ্যানাথ বাবু তাঁহার পক্ষে হাইকোর্টের উকিল ছিলেন, তিনি স্বয়ং এই সংবাদ লইয়া রাধারাণীর মাতার কুটীরে উপস্থিত হলেন। সুসংবাদ শুনিয়া রুগ্নার অবিরল নয়নাশ্রু পড়িতে লাগিল।

তিনি নয়নাশ্রু সংবরণ করিয়া কামাখ্যাবাবুকে বলিলেন, "যে প্রদীপ নিবিয়াছে, তাহাতে তেল দিলে কি হইবে? আপনার এ সুসংবাদেও আমার আর প্রাণরক্ষা হইবে না। আমার আয়ুঃশেষ হইয়াছে। তবে আমার এই সুখ যে, রাধারাণী আর অনাহারে প্রাণত্যাগ করিবে না। তাই বা কে জানে? সে বালিকা, তাহার সম্পত্তি কে রক্ষা করিবে? কেবল আপনি ভরসা। আপনি আমার এই অন্তিমকালে আমারে একটি ভিক্ষা দিউন—না হলে আর কাহার কাছে চাহিব?"

কামাখ্যাবাবু অতি ভদ্রলোক এবং তিনি রাধারাণীর পিতার বন্ধু ছিলেন। রাধারাণীর মাতা দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইলে, তিনি রাধারাণীর মাতাকে বলিয়াছিলেন যে, "যতদিন না আপীল নিষ্পত্তি পায়, অন্ততঃ ততদিন তোমরা আসিয়া আমার গৃহে অবস্থান কর, আমি আপনার মাতার মত তোমাকে রাখিব।" রাধারাণীর মাতা তাহাতে অস্বীকৃতা হইয়াছিলেন। পরিশেষে কামাখ্যাবাবু কিছু কিছু মাসিক সাহায্য করিতে চাহিলেন। "এখনও কিছু হাতে আছে—আবশ্যক হইলে চাহিয়া লইব।" এইরূপ মিথ্যা কথা বলিয়া রাধারাণীর মাতা সে সাহায্য গ্রহণে অস্বীকৃতা হইয়াছিলেন। রুক্মিণীকুমারের দানগ্রহণ তাঁহাদিগের প্রথম ও শেষ দানগ্রহণ।

কামাখ্যাবাবু এতদিন বুঝিতে পারেন নাই যে, তাঁহারা এরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছেন। দশা দেখিয়া কামাখ্যাবাবু অত্যন্ত কাতর হইলেন; আবার রাধারাণীর মাতা যুক্তকরে তাঁহার কাছে ভিক্ষা চাহিলেন দেখিয়া আরও কাতর হইলেন, বলিলেন, "আপনি আজ্ঞা করুন, আমি কি করিব? আপনার যাহা প্রয়োজনীয় আমি তাহাই করিব।"

রাধারাণীর মাতা বলিলেন,—"আমি চলিলাম, কিন্তু রাধারাণী রহিল। এক্ষণে আদালত হইতে আমার শ্বশুরের যথার্থ উইল সিদ্ধ হইয়াছে; অতএব রাধারাণী একা সম্পত্তির অধিকারিণী হইবে। আপনি তাহাকে দেখিবেন, আপনার কন্যার ন্যায় তাহাকে রক্ষা করিবেন, এই আমার ভিক্ষা। আপনি এই কথা স্বীকার করিলেই আমি সুখে মরিতে পারি।"

কামাখ্যাবাবু বলিলেন, "আমি আপনার নিকট শপথ করিতেছি, আমি রাধারাণীকে আপনার কন্যার অধিক যত্ন করিব। আমি কায়মনোবাক্যে এ কথা কহিলাম, আপনি বিশ্বাস করুন।"

যিনি মুমূর্ষু, তিনি কামাখ্যাবাবুর চক্ষের জল দেখিয়া তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিলেন। তাঁহার সেই শীর্ণ শুষ্ক অধরে একটু আহ্লাদের হাসি দেখা দিল। হাসি দেখিয়া কামাখ্যাবাবু বুঝিলেন, ইনি আর বাঁচিবেন না।

কামাখ্যাবাবু তাঁহাকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেন যে, "এক্ষণে আমার গৃহে চলুন, পরে ভদ্রাসন দখল হইলে আসিবেন।" রাধারাণীর মাতার যে অহঙ্কার, সে দারিদ্র্যজনিত—এজন্য দরিদ্রাবস্থায় তাঁহার গৃহে যাইতে চাহেন নাই। এক্ষণে আর দারিদ্র্য নাই, সুতরাং আর সে অহঙ্কারও নাই। এক্ষণে তিনি যাইতে সম্মত হইলেন। কামাখ্যাবাবু রাধারাণী ও তাহার মাতাকে সযত্নে নিজালয়ে লইয়া গেলেন।

তিনি রীতিমত পীড়িতার চিকিৎসা করাইলেন, কিন্তু তাঁহার জীবনরক্ষা হইল না, অল্পদিনেই তাঁহার মৃত্যু হইল।

উপযুক্ত সময়ে কামাখ্যাবাবু রাধারাণীকে তাহার সম্পত্তিতে দখল দেওয়াইলেন। কিন্তু রাধারাণী বালিকা বলিয়া তাহাকে নিজবাটীতে একা থাকিতে দিলেন না, আপন গৃহেই রাখিলেন।

কালেক্টর সাহেব রাধারাণীর সম্পত্তি কোর্ট-অব্-ওয়ার্ডসের অধীনে আনিবার জন্য যত্ন পাইলেন, কিন্তু কামাখ্যাবাবু বিবেচনা করিলেন, আমি রাধারাণীর জন্য যতদূর করিব, সরকারী কর্ম্মচারিগণ ততদূর করিবে না। কামাখ্যাবাবুর কৌশলে কালেক্টার সাহেব নিরস্ত হইলেন। কামাখ্যাবাবু স্বয়ং রাধারাণীর সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন।

বাকি রাধারাণীর বিবাহ। কিন্তু কামাখ্যাবাবু নব্যতন্ত্রের লোক—বাল্যবিবাহে তাঁহার দ্বেষ ছিল। তিনি বিবেচনা করিলেন যে, রাধারাণীর বিবাহ তাড়াতাড়ি না দিলে জাতি গেল মনে করে, এমত আর কেহ নাই। অতএব

যবে রাধারাণী স্বয়ং বিবেচনা করিয়া বিবাহে ইচ্ছুক হইবে, তবে তাহার বিবাহ দিব এখন সে লেখাপড়া শিখুক।

এই ভাবিয়া কামাখ্যাবাবু রাধারাণীর বিবাহের কোন উদ্যোগ না করিয়া তাহাকে উত্তমরূপে সুশিক্ষিত করাইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পাঁচ বৎসর গেল—রাধারাণী পরম সুন্দর ষোড়শবর্ষীয়া কুমারী। কিন্তু সে অন্তঃপুরমধ্যে বাস করে, তাহার সে রূপরাশি কেহ দেখিতে পায় না। এক্ষণে রাধারাণীর সম্বন্ধ করিবার সময় উপস্থিত হইল। কামাখ্যাবাবুর ইচ্ছা, রাধারাণীর মনের কথা বুঝিয়া তাহার সম্বন্ধ করেন, তত্ত্ব জানিবার জন্য আপনার কন্যা বসন্তকুমারীকে ডাকিলেন।

বসন্তের সঙ্গে রাধারাণীর সখীত্ব। উভয়ে সমবয়স্কা এবং উভয়ের অত্যন্ত প্রণয়। কামাখ্যাবাবু বসন্তকে আপনার মনোগত কথা বুঝাইয়া বলিলেন।

বসন্ত সলজ্জভাবে অথচ অল্প হাসিতে হাসিতে পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "রুক্মিণীকুমার রায় কেহ আছে?"

কামাখ্যাবাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "না। তা ত জানি না। কেন?"

বসন্ত বলিল, "রাধারাণী রুক্মিণীকুমার ভিন্ন আর কাহাকেও বিবাহ করিবে না।"

কামাখ্যা। সে কি? রাধারাণীর সঙ্গে অন্য ব্যক্তির পরিচয় কি প্রকারে হইল?

বসন্ত অবনতমুখে অল্প হাসিল। সে রথের রাত্রির বিবরণ সবিস্তারে রাধারাণীর কাছে শুনিয়াছিল, পিতার সাক্ষাতে সকল কথা বিবৃত করিল। শুনিয়া কামাখ্যাবাবু রুক্মিণীকুমারের প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "রাধারাণীকে বুঝাইয়া বলিও, রাধারাণী একটা মহাভ্রমে পড়িয়াছে। বিবাহ কৃতজ্ঞতা অনুসারে কর্ত্তব্য নহে। রুক্মিণীকুমারের নিকট রাধারাণীর কৃতজ্ঞতাস্বীকারের যদি সময় ঘটে, তবে অবশ্য প্রত্যুপকার করিতে হইবে, কিন্তু বিবাহে রুক্মিণীকুমারের কোন দাবীদাওয়া নাই। তাহাও আবার সে কি জাতি, কত বয়স, তাহা কেহ জানে না। তাহার পরিবার-সন্তানাদি থাকিবার সম্ভাবনা, রুক্মিণীকুমারের বিবাহ করিবারই বা সম্ভাবনা কি?"

বসন্ত বলিল, "সম্ভাবনা কিছুই নাই, তাহাও রাধারাণী বিলক্ষণ বুঝিয়াছে। কিন্তু সেই রাত্রি অবধি রুক্মিণীকুমারের একটি মানসিক প্রতিমা গড়িয়া আপনার মনে তাহা স্থাপিত করিয়াছে। যেমন দেবতাকে লোকে পূজা করে, রাধারাণী সেই প্রতিমা তেমনি করিয়া প্রত্যহ মনে মনে পূজা করে; এই পাঁচ বৎসর রাধারাণী আমাদের বাড়ী আসিয়াছে, এই পাঁচ বৎসর এমন দিন প্রায়ই যায় নাই যে, রাধারাণী রুক্মিণীকুমারের কথা আমার সাক্ষাতে একবারও বলে নাই। আর কেহ রাধারাণীকে বিবাহ করিলে তাহার স্বামী সুখী হইবে না।"

কামাখ্যাবাবু মনে মনে ভাবিলেন, "ইহা একটি বাতিক। ইহার একটু চিকিৎসা আবশ্যক। কিন্তু প্রথম চিকিৎসা বোধ হয় রুক্মিণীকুমারের সন্ধান করা।"

কামাখ্যাবাবু রুক্মিণীকুমারের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। স্বয়ং কলিকাতায় তাঁহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। বন্ধুবর্গকেও সেই সন্ধানে নিযুক্ত করিলেন। দেশে দেশে আপনার মক্কেলগণকে পত্র লিখিলেন। প্রতি সংবাদ-পত্রে বিজ্ঞাপন দিলেন। সে বিজ্ঞাপন এইরূপ—

"বাবু রুক্মিণীকুমার রায়, নিম্ন স্বাক্ষরকারী ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন—বিশেষ প্রয়োজন আছে। ইহাতে রুক্মিণীবাবুর সন্তোষের ব্যতীত অসন্তোষের কারণ উপস্থিত হইবে না। ইত্যাদি—শ্রী—"

কিন্তু কিছুতেই রুক্মিণীকুমারের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। দিন গেল, মাস গেল, বৎসর গেল, তথাপি কৈ রুক্মিণীকুমার আসিল না।

ইহার পর রাধারাণীর আর একটি ঘোরতর বিপদ্ উপস্থিত হইল—কামাখ্যাবাবুর লোকান্তরগতি হইল। রাধারাণী ইহাতে অত্যন্ত শোকাতুরা হইলেন; দ্বিতীয় বার পিতৃহীনা হইলেন মনে করিলেন। কামাখ্যাবাবুর শ্রাদ্ধাদির পর রাধারাণী আপন বাটীতে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন এবং নিজ সম্পত্তির তত্ত্বাবধান স্বয়ং করিতে লাগিলেন। কামাখ্যাবাবুর বিচক্ষণতা হেতু রাধারাণীর সম্পত্তি বিস্তর বাড়িয়াছিল।

বিষয় হস্তে লইয়া রাধারাণী প্রথমেই দুই লক্ষ মুদ্রা গবর্ণমেণ্টে প্রেরণ করিলেন। তৎসঙ্গে এই প্রার্থনা করিলেন যে, এই অর্থে তাঁহার নিজগ্রামে একটি অনাথনিবাস স্থাপিত হউক। তাহার নাম হউক—"রুক্মিণীকুমারের প্রাসাদ।"

গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ প্রস্তাবিত নাম শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইলেন, কিন্তু তাহাতে কে কথা কহিবে? অনাথনিবাস সংস্থাপিত হইল। রাধারাণীর মাতা

দরিদ্রাবস্থায় নিজ গ্রাম ত্যাগ করিয়া শ্রীরামপুরে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, কেন না, যে গ্রামে যে ধনী ছিল, সে সহসা দরিদ্র হইলে, সে গ্রামে তার বাস করা কষ্টকর হয়। তাঁহাদিগের নিজ গ্রাম শ্রীরামপুর হইতে কিঞ্চিৎ দূর—আমরা সে গ্রামকে রাজপুর বলিব। এক্ষণে রাধারাণী রাজপুরেই বাস করিতেন। অনাথনিবাসও রাধারাণীর বাড়ীর সম্মুখে, রাজপুরে সংস্থাপিত হইল। নানা দেশ হইতে দীন, দুঃখী, অনাথ আসিয়া তথায় বাস করিতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দুই এক বৎসর পরে একজন ভদ্রলোক সেই অনাথনিবাসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার বয়স ৩৫।৩৬ বৎসর। অবস্থা দেখিয়া অতি ধীর, গম্ভীর এবং অর্থশালী লোক বোধ হয়। তিনি সেই "রুক্মিণীকুমারের প্রাসাদের" দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রক্ষকগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কাহার বাড়ী ?"

তাহারা বলিল, "এ কাহারও বাড়ী নহে, এস্থানে দুঃখী-অনাথ লোক থাকে। ইহাকে 'রুক্মিণীকুমারের প্রাসাদ' বলে।"

আগন্তুক বলিলেন, "আমি ইহার ভিতর গিয়া দেখিতে পারি ?"

রক্ষকগণ বলিল, "দীন-দুঃখী লোকেও ইহার ভিতর অনায়াসে যাইতেছে—আপনাকে নিষেধ কি ?"

দর্শক ভিতরে গিয়া, সব দেখিয়া, প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বলিলেন, "বন্দোবস্ত দেখিয়া আমার বড় আহ্লাদ হইয়াছে। কে এই অন্নসত্র দিয়াছেন ? রুক্মিণীকুমার কি তাঁহার নাম ?"

রক্ষকেরা বলিল, "একজন স্ত্রীলোক এই অন্নসত্র দিয়াছেন।"

দর্শক জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে ইহাকে 'রুক্মিণীকুমারের প্রাসাদ' বলে কেন ?"

রক্ষকেরা বলিল, "তাহা আমরা কেহ জানি না।"

"রুক্মিণীকুমার কাহার নাম ?"

"কাহারও নয়।"

"যিনি অন্নসত্র দিয়াছেন, তাঁহার নিবাস কোথায়।"

রক্ষকেরা সম্মুখে অতি বৃহৎ অট্টালিকা দেখাইয়া দিল।

আগন্তুক জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "তোমরা যাঁহার বাড়ী দেখাইয়া দিলে, তিনি পুরুষমানুষের সাক্ষাতে বাহির হইয়া থাকেন ? রাগ করিও না, এখন

অনেক বড়মানুষের মেয়ে মেমলোকের মত বাহিরে বাহির হইয়া থাকে, এইজন্যই জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

রক্ষকেরা উত্তর করিল—"ইনি সেরূপ চরিত্রের নন। পুরুষের সমক্ষে বাহির হন না!"

প্রশ্নকর্ত্তা ধীরে ধীরে রাধারাণীর অট্টালিকার অভিমুখে গিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

যিনি আসিয়াছিলেন, তাঁহার পরিচ্ছদ সচরাচর বাঙ্গালী ভদ্রলোকের মত, বিশেষ পারিপাট্য, অথবা পারিপাট্যের বিশেষ অভাবও কিছু ছিল না; কিন্তু তাঁহার অঙ্গুলীতে একটি হীরকাঙ্গুরীয় ছিল; তাহা দেখিয়া রাধারাণীর কর্ম্মকারকগণ অবাক্ হইয়া তৎপ্রতি চাহিয়া রহিল, এত বড় হীরা তাহারা কখন অঙ্গুরীয়ে দেখে নাই। তাঁহার সঙ্গে কোন লোক ছিল না, এজন্য তাহারা জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না যে, কে ইনি? মনে করিল, বাবু স্বয়ং পরিচয় দিবেন। কিন্তু বাবু কোন পরিচয় দিলেন না। তিনি রাধারাণীর দেওয়ানজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার হস্তে একখানি পত্র দিলেন। বলিলেন, "এই পত্র আপনার মুনিবের কাছে পাঠাইয়া দিয়া আমাকে উত্তর আনিয়া দিন।"

দেওয়ানজী বলিলেন, "আমার মুনিব স্ত্রীলোক, আবার অল্পবয়স্কা। এ জন্য তিনি নিয়ম করিয়াছেন যে, কোন্ অপরিচিত লোকে পত্র আনিলে আমরা তাহা না পড়িয়া তাঁহার কাছে পাঠাইব না।"

আগন্তুক বলিলেন, "আপনি পড়ুন।"

দেওয়ানজী পত্র পড়িলেন—

"প্রিয় ভগিনী!

"এ ব্যক্তি পুরুষ হইলেও, ইঁহার সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিও—ভয় করিও না। যে মত ঘটে, আমাকে লিখিও।

—শ্রীমতী বসন্তকুমারী।"

কামাখ্যাবাবুর কন্যার স্বাক্ষর দেখিয়া কেহ আর কিছু বলিল না। পত্র অন্তঃপুরে গেল। অন্তঃপুর হইতে পরিচারিকা পত্রবাহক বাবুকে লইতে আসিল। আর কেহ সঙ্গে যাইতে পারিল না—হুকুম নাই।

পরিচারিকা বাবুকে লইয়া এক সুসজ্জিত গৃহে বসাইল। রাধারাণীর

অন্তঃপুরে সেই প্রথম পুরুষ মানুষ প্রবেশ করিল। দেখিয়া একজন পরিচারিকা রাধারাণীকে ডাকিতে গেল, আর একজন অন্তরালে থাকিয়া আগন্তুককে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। দেখিল যে, তাঁহার বর্ণ টুকু গৌর, স্ফুটিত মল্লিকারাশির মত গৌর, তাঁহার শরীর দীর্ঘ, ঈষৎ স্থূল ; কপাল দীর্ঘ, অতি সূক্ষ্ম, পরিষ্কার—ঘনকৃষ্ণ সুরঞ্জিত কেশজালে মণ্ডিত ; চক্ষু সুবৃহৎ, কটাক্ষ স্থির ; ভ্রূযুগ সূক্ষ্ম ঘন, দূরায়ত এবং নিবিড় কৃষ্ণ ; নাসিকা দীর্ঘ এবং উন্নত ; ওষ্ঠাধর রক্তবর্ণ, ক্ষুদ্র এবং কোমল ; গ্রীবা দীর্ঘ, অথচ মাংসল ; অন্যান্য অঙ্গ বস্ত্রে আচ্ছাদিত, কেবল অঙ্গুলীগুলি দেখা যাইতেছে, সেগুলি শুভ্র, সুগঠিত, একটি একটি বৃহদাকার হীরকে রঞ্জিত।

রাধারাণী সেই স্থানে আসিয়া পরিচারিকাকে বিদায় করিয়া দিলেন। রাধারাণী আসিবামাত্র দর্শকের বোধ হইল যে, সেই কক্ষমধ্যে এক অভিনব সূর্য্যোদয় হইল—রূপের আলোকে তাঁহার মস্তকের কেশ পর্য্যন্ত যেন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

আগন্তুকের উচিত প্রথম কথা কহা—কেন না তিনি পুরুষ এবং বয়োজ্যেষ্ঠ —কিন্তু তিনি সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। রাধারাণী একটু অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "আপনি এরূপ গোপনে আমার সঙ্গে সাক্ষাতের অভিলাষ করিয়াছেন কেন? আমি স্ত্রীলোক, কেবল বসন্তের অনুরোধেই আমি ইহা স্বীকার করিয়াছি।"

আগন্তুক বলিলেন, "আমি আপনার সহিত এরূপ সাক্ষাতের অভিলাষী হইয়াছি, ঠিক তা নহে।"

রাধারাণী অপ্রতিভ হইলেন। বলিলেন, "তা নয়, বটে! তবে বসন্ত কি জন্য এরূপ অনুরোধ করিয়াছেন, তাহা কিছু লেখেন নাই। বোধ হয়, আপনি জানেন।"

আগন্তুক একখানি পুরাতন সংবাদপত্র বাহির করিয়া তাহা রাধারাণীকে দেখাইলেন। রাধারাণী পড়িলেন, কামাখ্যাবাবুর স্বাক্ষরিত রুক্মিণীকুমার সম্বন্ধে সেই বিজ্ঞাপন। রাধারাণী দাঁড়াইয়াছিলেন—দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া নারিকেল-পত্রের ন্যায় কাঁপিতে লাগিলেন। আগন্তুকের দেবতুল্য গঠন দেখিয়া মনে ভাবিলেন, ইনিই আমার সেই রুক্মিণীকুমার! আর থাকিতে পারিলেন না—জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, "আপনার নাম কি রুক্মিণীকুমার বাবু?"

আগন্তুক বলিলেন, "না"। "না" শব্দ শুনিয়াই রাধারাণী ধীরে ধীরে আসন গ্রহণ করিলেন। আর দাঁড়াইতে পারিলেন না—তাঁহার বুক যেন ভাঙ্গিয়া

গেল। আগন্তুক বলিলেন, "না; আমি যদি রুক্মিণীকুমার হইতাম, তাহা হইলে কামাখ্যা বাবু এ বিজ্ঞাপন দিতেন না। কেন না, তাঁহার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। কিন্তু যখন এই বিজ্ঞাপন বাহির হয়, তখনই আমি ইহা দেখিয়া তুলিয়া রাখিয়াছিলাম।"

রাধারাণী বলিলেন, "যদি আপনার সঙ্গে এই বিজ্ঞাপনের কোন সম্বন্ধ নাই, তবে আপনি ইহা তুলিয়া রাখিয়াছিলেন কেন?"

উত্তরকারী বলিলেন, "একটি কৌতূহলের জন্য। আজি আট দশ বৎসর হইল, আমি যেখানে সেখানে বেড়াইতাম—কিন্তু লোকলজ্জাভয়ে আপনার নামটা গোপন করিয়া কাল্পনিক নাম ব্যবহার করিতাম। কাল্পনিক নাম রুক্মিণীকুমার। আপনি অত বিমনা হইতেছেন কেন?"

রাধারাণী একটু স্থির হইলেন—আগন্তুক বলিতে লাগিলেন—"যথার্থ রুক্মিণী-কুমার নাম ধরে, এমন কাহাকেও চিনি না। যদি কেহ আমারই তল্লাস করিয়া থাকে—তাহা সম্ভব নহে—তথাপি কি জানি, সাত পাঁচ ভাবিয়া বিজ্ঞাপনটি তুলিয়া রাখিলাম। কিন্তু কামাখ্যাবাবুর কাছে আসিতে সাহস হইল না।"

"পরে?"

"পরে কামাখ্যাবাবুর শ্রাদ্ধে তাঁহার পুত্রগণ আমাকে নিমন্ত্রণ করিল, কিন্তু আমি কার্য্যগতিকে আসিতে পারি নাই। সম্প্রতি সে ত্রুটির ক্ষমা প্রার্থনার জন্য তাঁহার পুত্রদিগের নিকট আসিলাম। কৌতূহলবশতঃ বিজ্ঞাপন সঙ্গে আনিয়াছিলাম। প্রসঙ্গক্রমে উহার কথা উত্থাপন করিয়া কামাখ্যাবাবুর জ্যেষ্ঠ-পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, এ বিজ্ঞাপন কেন দেওয়া হইয়াছিল? কামাখ্যা-বাবুর পুত্র বলিলেন যে, রাধারাণীর অনুরোধে। আমিও এক রাধারাণীকে চিনিতাম;—এক বালিকা—আমি এক দিন দেখিয়া তাহাকে আর ভুলিতে পারিলাম না। সে মাতার পথ্যের জন্য আপনি অনাহারে থাকিয়া বনফুলের মালা গাঁথিয়া—সেই অন্ধকার বৃষ্টিতে—" বক্তা আর কথা কহিতে পারিলেন না। তাঁহার চক্ষু জলে পূরিয়া গেল। রাধারাণীরও চক্ষু জলে ভাসিতে লাগিল। চক্ষু মুছিয়া রাধারাণী বলিল, "ইতর লোকের কথায় এখন প্রয়োজন কি? আপনার কথা বলুন।"

আগন্তুক উত্তর করিলেন,—"রাধারাণী ইতর লোক নহে। যদি সংসারে কেহ দেবকন্যা থাকে, তবে সেই রাধারাণী। যদি কাহাকে পবিত্র, সরলচিত্ত এ সংসারে আমি দেখিয়া থাকি, তবে সেই রাধারাণী। যদি কাহারও কথায়

অমৃত থাকে, তবে সেই রাধারাণী—যথার্থ অমৃত। বর্ণে বর্ণে অপ্সরার বীণা বাজে, যেন কথা কহিতে বাধ বাধ করে, অথচ সকল কথা পরিষ্কার, সুমধুর, অতি সরল। আমি এমন কণ্ঠ কখন শুনি নাই—এমন কথা কখনও শুনি নাই!”

রুক্মিণীকুমার—এক্ষণে ইঁহাকে রুক্মিণীকুমার বলা যাউক—ঐ সঙ্গে মনে মনে বলিলেন, “আবার আজ বুঝি তেমনই কথা শুনিতেছি!”

রুক্মিণীকুমার মনে মনে ভাবিতেছিলেন, আজ এত দিন হইল, সেই বালিকার কণ্ঠস্বর শুনিয়াছিলাম, ঠিক আজও সে কণ্ঠ আমার মনের ভিতর জাগিতেছে। যেন কাল শুনিয়াছি। অথচ আজ এই সুন্দরীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া আমার সেই রাধারাণীকেই বা মনে পড়ে কেন? এই কি সেই? আমি মূর্খ। কোথায় সেই দীন-দুঃখিনী, কুটীরবাসিনী ভিখারিণী—আর কোথায় এই উচ্চপ্রাসাদ-বিহারিণী ইন্দ্রাণী। আমি সে রাধারাণীকে অন্ধকারে ভাল করিয়া দেখিতে পাই নাই, সুতরাং জানি না যে, সে সুন্দরী কি কুৎসিতা, কিন্তু এই শচীনিন্দিতা রূপসীর শতাংশের একাংশের রূপও যদি তাহার থাকে, তাহা হইলে সেও লোকমনোমোহিনী বটে!”

এদিকে রাধারাণী অতৃপ্তশ্রবণে রুক্মিণীকুমারের মধুর বচনগুলি শুনিতেছিলেন—মনে মনে ভাবিতেছিলেন, তুমি যাহা পাপিষ্ঠা রাধারাণীকে বলিতেছ, কেবল তোমাকেই সেই কথাগুলি বলা যায়। তুমি আজ আট বৎসরের পর রাধারাণীকে ছলিবার জন্য কোন্ নন্দনকানন ছাড়িয়া পৃথিবীতে নামিলে? এত দিনে কি আমার হৃদয়ের পূজায় প্রীত হইয়াছ? তুমি কি অন্তর্য্যামী? নহিলে আমি লুকাইয়া লুকাইয়া—হৃদয়ের ভিতরে লুকাইয়া তোমাকে যে পূজা করি, তাহা তুমি কি প্রকারে জানিলে?

এই প্রথম দুই জনে স্পষ্ট দিবালোকে পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। দুই জনে দুই জনের মুখপানে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলেন, আর এমন আছে কি? এই সসাগরা, নদনদী-চিত্রিতা, জীবসঙ্কুলা পৃথিবীতলে এমন তেজোময়, এমন মধুর, এমন সুখময়, এমন চঞ্চল অথচ স্থির, এমন সহাস্য অথচ গম্ভীর, এমন প্রফুল্ল, অথচ ব্রীড়াময়, এমন আছে কি? চিরপরিচিত অথচ অত্যন্ত অভিনব, মূহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে অভিনব মাধুরিমাময়, আত্মীয় অথচ অত্যন্ত পর, চিরস্মৃত অথচ অদৃষ্টপূর্ব্ব—কখনও দেখি নাই, আর এমন দেখিব না, এমন আর আছে কি?

রাধারাণী বলিল,—বড় কষ্টে বলিতে হইল, কেন না, চক্ষের জল থামে না, আবার সেই চক্ষের জলের উপর কোথা হইতে পোড়া হাসি আসিয়া পড়ে—

রাধারাণী বলিল, "তা আপনি এতক্ষণ কেবল সেই ভিখারিণীর কথাই বলিলেন, আমাকে যে কেন দর্শন দিয়াছেন, তা ত এখনও বলেন নাই।"

হাঁ গা, এমন করিয়া কি কথা কহা যায় গা? যাহার গলা ধরিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা করিতেছে, 'প্রাণেশ্বর! দুঃখিনীর সর্ব্বস্ব! চিরবাঞ্ছিত!' বলিয়া যাহাকে ডাকিতে ইচ্ছা করিতেছে, আবার যাকে সেই সঙ্গে 'হাঁ গা, সেই রাধারাণী পোড়ারমুখী তোমার কে হয় গা' বলিয়া তামাসা করিতে ইচ্ছা করিতেছে,—তাহার সঙ্গে 'আপনি', 'মশাই', 'দর্শন দিয়াছেন,' এই সকল কথা নিয়ে কি কথা কহা যায় গা? তোমরা পাঁচ জন রসিকা, প্রেমিকা, বাক্চতুরা, বয়োধিকা ইত্যাদি আছ, তোমরা পাঁচ জনে বল দেখি, ছেলেমানুষ রাধারাণী কেমন ক'রে এমন কথা কয় গা?

রাধারাণী মনে মনে একটু পরিতাপ করিল; কেন না, কথাটা একটু ভৎর্সনার মত হইল। রুক্মিণীকুমার একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন,—"তাই বলিতেছিলাম, আমি সেই রাধারাণীকে চিনিতাম—রাধারাণীকে মনে পড়িল, একটু—এতটুকু অন্ধকার রাত্রে জোনাকীর ন্যায়—এতটুকু আশা হইল যে, যদি এই রাধারাণী আমার সেই রাধারাণী হয়।"

"তোমার রাধারাণী!" রাধারাণী ছল করিয়া চুপি চুপি এই কথাটি বলিয়া মুখ নত করিয়া ঈষৎ হাসিল। হাঁ গা, না হেসে কি থাকা যায় গা? তোমরা আমার রাধারাণীর নিন্দা করিও না।

রুক্মিণীকুমারও মনে মনে ছল ধরিল, "এ 'তুমি' বলে কেন? কে এ?" প্রকাশ্যে বলিল, "আমারই রাধারাণী। আমি একরাত্রিমাত্র তাহাকে দেখিয়া—দেখিয়াছিই বা কেমন করিয়া বলি—এই আট বৎসরেও তাহাকে ভুলি নাই। আমারই রাধারাণী।"

রাধারাণী বলিল, "হোক আপনারই রাধারাণী!"

রুক্মিণীকুমার বলিতে লাগিলেন, "সেই ক্ষুদ্র আশায় আমি কামাখ্যাবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলাম, রাধারাণী কে? কামাখ্যাবাবুর পুত্র সবিস্তারে পরিচয় দিতে বোধ হয় অনিচ্ছুক ছিলেন। কেবল বলিলেন, "আমাদিগের কোন আত্মীয়ের কন্যা।' যেখানে তাঁহাকে অনিচ্ছুক দেখিলাম, সেখানে আর অধিক পীড়াপীড়ি করিলাম না, কেবল জিজ্ঞাসা করিলাম, 'রাধারাণী কেন রুক্মিণীকুমারের সন্ধান করিয়াছিলেন, শুনিতে পাই কি? যদি প্রয়োজন হয় ত বোধ করি, আমি কিছু সন্ধান দিতে পারি।' আমি এই কথা বলিলে তিনি

বলিলেন, 'কেন রাধারাণী রুক্মিণীবাবুকে খুঁজিতেছিলেন, তাহা আমি সবিশেষ জানি না, আমার পিতৃঠাকুর জানিতেন, বোধ করি, আমার ভগিনীও জানিতে পারেন। যেখানে আপনি সন্ধান দিতে পারেন বলিতেছেন, সেখানে আমার ভগিনীকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতে হইতেছে।' এই বলিয়া তিনি উঠিলেন। প্রত্যাগমন করিয়া তিনি আমাকে যে পত্র দিলেন, সে পত্র আপনাকে দিয়াছি। তিনি আমাকে সেই পত্র দিয়া বলিলেন, "আমার ভগিনী সবিশেষ কিছু ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া বলিলেন না, কেবল এই পত্র দিলেন, আর বলিলেন যে, এই পত্র লইয়া তাঁহাকে স্বয়ং রাজপুরে যাইতে বলুন। রাজপুরে যিনি অন্নসত্র দিয়াছেন, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিলেন। আমি সেই পত্র লইয়া আপনার কাছে আসিয়াছি। কোন অপরাধ করিয়াছি কি ?"

রাধারাণী বলিল, "জানি না। বোধ হয় যে, আপনি মহাভ্রমে পতিত হইয়াই এখানে আসিয়াছেন, আপনার রাধারাণী কে, তাহা আমি চিনি কি না, বলিতে পারিতেছি না। সে রাধারাণীর কথা কি, শুনিলে বলিতে পারি, আমা হইতে তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যাইবে কি না।"

রুক্মিণীকুমার সেই রথের কথা সবিস্তারে বলিলেন, কেবল নিজদত্ত অর্থবস্ত্রের কথা কিছু বলিলেন না। রাধারাণী বলিলেন—"স্পষ্ট কথা মার্জ্জনা করিবেন। আপনাকে রাধারাণীর কোন কথা বলিতে সাহস হয় না, কেন না, আপনাকে দয়ালু লোক বলিয়া বোধ হইতেছে না। যদি আপনি সেরূপ দয়ার্দ্রচিত্ত হইতেন, তাহা হইলে আপনি যে ভিখারী বালিকার কথা বলিলেন, তাহাকে অমন দুর্দ্দশাপন্ন দেখিয়া অবশ্য তার কিছু আনুকূল্য করিতেন। কৈ আনুকূল্য করার কথা ত কিছু আপনি বলিলেন না ?"

রুক্মিণীকুমার বলিলেন, "আনুকূল্য বিশেষ কিছুই করিতে পারি নাই। আমি সেদিন নৌকাপথে রথ দেখিতে আসিয়াছিলাম ; পাছে কেহ জানিতে পারে, এই জন্য রুক্মিণীকুমার রায় পরিচয়ে লুকাইয়া আসিয়াছিলাম—অপরাহ্ণে ঝড়বৃষ্টি হওয়ায় বোটে থাকিতে সাহস না করিয়া একা তটে উঠিয়া আসিয়াছিলাম। সঙ্গে যাহা অল্প ছিল, তাহা রাধারাণীকেই দিয়াছিলাম ; কিন্তু সে অতি সামান্য। পরদিন প্রাতে আসিয়া উহাদের বিশেষ সংবাদ লইব মনে করিয়াছিলাম ; কিন্তু সেই রাত্রে আমার পিতার পীড়ার সংবাদ পাইয়া তখনই কাশী যাইতে হইল। পিতা অনেকদিন রুগ্ন হইয়া রহিলেন ; কাশী হইতে প্রত্যাগমন করিতে আমার বৎসরাধিক বিলম্ব হইল। বৎসর পরে আমি ফিরিয়া

আসিয়া আবার সেই কুটীরে সন্ধান করিলাম—কিন্তু তাহাদিগকে আর সেখানে দেখিলাম না।”

রাধা। একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিতেছি। বোধ হয়, সে রথের দিন নিরাশ্রয়ে বৃষ্টি-বাদলে আপনাকে সেই কুটীরেই আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। আপনি কতক্ষণ সেখানে অবস্থিতি করিলেন ?

রু। অধিকক্ষণ নহে। আমি যাহা রাধারাণীর হাতে দিয়াছিলাম, তাহা দেখিবার জন্য রাধারাণী আলো জ্বালিতে গেল—আমি সেই অবসরে তাহার বস্ত্র কিনিতে চলিয়া আসিলাম।

রাধা। আর কি দিয়া আসিলেন ?

রু। আর কি দিব ? একখানি ক্ষুদ্র নোট ছিল, তাহা কুটীরে রাখিয়া আসিলাম।

রাধা। নোটখানি ওরূপে দেওয়া বিবেচনাসিদ্ধ হয় নাই—তাহারা মনে করিতে পারে, আপনি নোটখানি হারাইয়া গিয়াছেন।

রু। না, আমি পেন্সিলে লিখিয়া দিয়াছিলাম, “রাধারাণীর জন্য।” তাহাতে নাম স্বাক্ষর করিয়াছিলাম ‘রুক্মিণীকুমার রায়’। যদি সেই রুক্মিণীকুমারকে এই রাধারাণী অন্বেষণ করিয়া থাকে, এই ভরসায় বিজ্ঞাপনটি তুলিয়া রাখিয়াছিলাম।

রাধা। তাই বলিতেছিলাম, আপনাকে দয়ার্দ্রচিত্ত বলিয়া বোধ হয় না। যে আপনার শ্রীচরণ দর্শন জন্য—এইটুকু বলিতেই—আ ছিছি রাধারাণী! ফুলের কুঁড়ির ভিতর যেমন জল ভরা থাকে, ফুলটি নীচু করিলে যেমন ঝর্‌ঝর্ করিয়া পড়িয়া যায়, রাধারাণী মুখ নত করিয়া এইটুকু বলিতেই তাহার চোখের জল ঝর্‌ঝর্ করিয়া পড়িতে লাগিল। অমনই যেদিকে রুক্মিণীকুমার ছিলেন, সেই-দিকের মাথার কাপড়টা বেশী করিয়া টানিয়া দিয়া সে ঘর হইতে রাধারাণী বাহির হইয়া গেল। রুক্মিণীকুমার বোধ হয় চক্ষের জলটুকু দেখিতে পান নাই, কি পাইয়াই থাকিবেন, বলা যায় না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বাহিরে আসিয়া, মুখে চক্ষে জল দিয়া অশ্রুচিহ্ন বিলুপ্ত করিয়া রাধারাণী ভাবিতে লাগিল। ভাবিল, “ইনি ত সেই রুক্মিণীকুমার। আমিও সেই রাধারাণী। দুইজনে দুই জনের জন্য মন তুলিয়া রাখিয়াছি। এখন উপায় ? আমি যে রাধারাণী, তা উঁহাকে বিশ্বাস করাইতে পারি—তার পর ? উনি কি জাতি, তা কে জানে ?

জাতিটা এখনই জানিতে পারা যায়। কিন্তু উনি যদি আমার জাতি না হন, তবে ধর্ম্মবন্ধন ঘটিবে না, চিরন্তনের যে বন্ধন, তাহা ঘটিবে না, প্রাণের বন্ধন ঘটিবে না। তবে আর উঁহার সঙ্গে কথায় কাজ কি? না হয় এ জন্মটা রুক্মিণীকুমার নাম জপ করিয়া কাটাইব। এতদিন সেই মালা জপ করিয়া কাটাইয়াছি, জোয়ারের প্রথম বেগটা কাটাইয়া দিয়াছি—বাকি কাল কাটিবে না কি?"

এই ভাবিতে ভাবিতে রাধারাণীর আবার নাকের পাটা ফাঁপিয়া উঠিল—আবার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। আবার সে জল দিয়া মুখ-চোখ ধুইয়া টোয়ালিয়া দিয়া মুছিয়া ঠিক হইয়া আসিল। রাধারাণী আবার ভাবিতে লাগিল—'আচ্ছা, যদি আমার জাতিই হন, তা হ'লেই বা ভরসা কি? উনি ত দেখিতেছি বয়ঃপ্রাপ্ত—কুমার এমন সম্ভাবনা কি? তা হলেনই বা বিবাহিত? না, না! তা হইবে না। নাম জপ করিয়া মরি, সে অনেক ভাল, সতীন সহিতে পারিব না।'

তবে এখন কর্ত্তব্য কি? জাতির কথাটা জিজ্ঞাসা করিয়াই কি হইবে? তবে রাধারাণীর পরিচয়টা দিই। আর উনি কে, তাহা জানিয়া লই, কেন না রুক্মিণী-কুমার ত ওঁর নাম নয়—তা ত শুনিলাম। যে নাম জপ করিয়া মরিতে হইবে, তা শুনিয়া লই। তারপর বিদায় দিয়া কাঁদিতে বসি। আ! পোড়ারমুখী বসন্ত! না বুঝিয়া, না জানিয়া, এ সামগ্রী কেন পাঠাইলি? জানিস্ না কি, এ জীবন-সমুদ্র অমন করিয়া মন্থন করিতে গেলে কাহারও কপালে অমৃত, কাহারও কপালে গরল উঠে।

"আচ্ছা, পরিচয়টা ত দিই।" এই ভাবিয়া রাধারাণী, যাহা প্রাণের অধিক যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিয়াছিল, তাহা বাহির করিয়া আনিল। সে সেই নোটখানি। বলিয়াছি, রাধারাণী তাহা তুলিয়া রাখিয়াছিল। রাধারাণী তাহা আঁচলে বাঁধিল। বাঁধিতে বাঁধিতে ভাবিতে লাগিল—

'আচ্ছা, যদি মনের বাসনা পূরিবার মতনই হয়, তবে শেষ কথাটা কে বলিবে?' এই ভাবিয়া রাধারাণী আপনা আপনি হাসিয়া লুটপাট হইল। "আ, ছি ছি! তা ত আমি পারিব না। বসন্তকে যদি আনাইতাম! ভাল, উঁহাকে এখন দু'দিন রাখিয়া বসন্তকে আনাইতে পারিব না? উনি না হয় সেই দুইদিন আমার লাইব্রেরী হইতে বই লইয়া পড়ুন না! পড়াশুনা করেন না কি? ওঁরই জন্য ত লাইব্রেরী করিয়া রাখিয়াছি। তা যদি দুইদিন থাকিতে রাজি না হন? উঁহার যদি কাজ থাকে, তবে কি হইবে? ওঁতে আমাতেই সে কথাটা কি হবে? ক্ষতি কি, ইংরেজের মেয়ের কি হয়? আমাদের দেশে তাতে নিন্দা আছে, তা

আমি দেশের লোকের নিন্দার ভয়ে কোন্ কাজই না করি ? এই যে উনিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত আমি বিয়ে করলেম না, এতে কে না কি বলে ? এত বয়স পর্য্যন্ত কুমারী,—তা এ কাজটাও না হয় ইংরেজের মেয়ের মত হইল।"

তারপর রাধারাণী বিষণ্ণ-মনে ভাবিল, "তা যেন হলো ; তাতেও বড় গোল ! মম-বাতিতে গড়া মেয়েদের মাঝখানে প্রথাটা এই যে, পুরুষ-মানুষেই কথাটা পাড়িবে। ইনি যদি কথা না পাড়েন ? না পাড়েন, তবে—হে ভগবান্ ! বলিয়া দাও, কি করিব ! লজ্জাও তুমি গড়িয়াছ—যে আগুনে আমি পুড়িতেছি, তাহাও তুমি গড়িয়াছ। এ আগুনে সে লজ্জা কি পুড়িবে না ? তুমি এই সহায়হীন অনাথাকে দয়া করিয়া পবিত্রতার আবরণে আবৃত করিয়া লজ্জার আবরণ কাড়িয়া লও। তোমার কৃপায় যেন আমি এক দণ্ডের জন্য মুখরা হই।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ভগবান্ বুঝি সে কথাও শুনিলেন। শুদ্ধচিত্তে যাহা বলিবে, তাহাই বুঝি তিনি শুনেন। রাধারাণী মৃদু হাসিতে হাসিতে গজেন্দ্রগমনে রুক্মিণীকুমারের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

রুক্মিণীকুমার তখন বলিলেন, "আপনি আমাকে বিদায় দিয়াও যান নাই, আমি যে কথা জানিবার জন্য আসিয়াছি, তাহাও জানিতে পারি নাই। তাই এখনও যাই নাই।"

রাধা। আপনি রাধারাণীর জন্য আসিয়াছেন, তাহা আমারও মনে আছে। এ বাড়ীতে একজন রাধারাণী আছে, সত্য বটে। সে আপনার নিকট পরিচিত হইবে কি না, সেই কথাটা ঠিক করিতে গিয়াছিলাম।

রু। তার পর ?

রাধারাণী তখন অল্প একটু হাসিয়া একবার আপনার পায়ের দিকে চাহিয়া, আপনার হাতের অলঙ্কার খুঁটিয়া, সেই ঘরে বসান একটা প্রস্তরনির্ম্মিত Niole প্রতিকৃতি পানে চাহিয়া, রুক্মিণীকুমারের পানে না চাহিয়া বলিল—"আপনি বলিয়াছেন, রুক্মিণীকুমার আপনার যথার্থ নাম নহে। রাধারাণীর যে আরাধ্য দেবতা, তাঁহার নাম এখনও শুনিতে পাই নাই।"

রুক্মিণীকুমার বলিলেন, "আরাধ্য দেবতা কে বলিল ?"

রাধারাণী কথাটা অনবধানে বলিয়া ফেলিয়াছিলেন, এখন সামলাইতে গিয়া বলিয়া ফেলিলেন, "নাম ঐরূপে জিজ্ঞাসা করিতে হয়।"

রুক্মিণীকুমার বলিল, "আমার নাম দেবেন্দ্রনারায়ণ রায়।"

রাধারাণী গুপ্তভাবে দুই হাত যুক্ত করিয়া মনে মনে ডাকিল, "জয় জগদীশ্বর! তোমার কৃপা অনন্ত।" প্রকাশ্যে বলিল, "রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণের নাম শুনিয়াছি।"

দেবেন্দ্রনারায়ণ বলিলেন, "অমন সকলেই রাজা কবলায়। আমাকে যে কুমার বলে, সে যথেষ্ট সম্মান করে।"

রা। এক্ষণে আমার সাহস বাড়িল। জানিলাম যে, আপনি আমার স্বজাতি। এখন স্পর্দ্ধা হইতেছে, আজি আপনাকে আমার আতিথ্য স্বীকার করাই।

দেবেন্দ্র। সে কথা পরে হবে। রাধারাণী কে?

রা। ভোজনের পর সে কথা বলিব।

দে। মনে দুঃখ থাকিলে ভোজনে তৃপ্তি হয় না।

রা। রাধারাণীর জন্য এত দুঃখ? কেন?

দে। তা জানি না, বড় দুঃখ—আট বৎসরের দুঃখ—তাই জানি।

রা। হঠাৎ রাধারাণীর পরিচয় দিতে আমার কিছু সঙ্কোচ হইতেছে। আপনি রাধারাণীকে পাইলে কি করিবেন?

দে। কি আর করিব? একবার দেখিব।

রা। একবার দেখিবার জন্য এই আট বৎসর এত কাতর?

দে। রকম রকমের মানুষ থাকে।

রা। আচ্ছা, আমি ভোজনের পর আপনাকে আপনার রাধারাণী দেখাইব। ঐ বড় আয়না দেখিতে পাইতেছেন; উহার ভিতর দেখাইব। চাক্ষুষ দেখিতে পাইবেন না।

দে। চাক্ষুষ সাক্ষাতেই বা কি আপত্তি? আমি যে আট বৎসর কাতর!

ভিতরে ভিতরে দুইজনে দুইজনকে বুঝিতেছেন কি না, জানি না, কিন্তু কথা-বার্ত্তা এইরূপ হইতে লাগিল। রাধারাণী বলিতে লাগিল, "সে কথাটায় তত বিশ্বাস হয় না। আপনি আট বৎসর পূর্ব্বে তাহাকে দেখিয়াছেন, তখন তাহার বয়স কত?"

দে। এগার হইবে।

রা। এগার বৎসরের বালিকার উপর এত অনুরাগ?

দে। হয় না কি?

রা। কখনও শুনি নাই।

দে। তবে মনে করুন কৌতূহল।

রা। সে আবার কি?

দে। শুধুই দেখিবার ইচ্ছা।

রা। তা দেখিব, ঐ বড় আয়নার ভিতর। আপনি বাহিরে থাকিবেন।

দে। কেন সম্মুখ-সাক্ষাতে আপত্তি কি ?

রা। কুলের কুলবতী।

দে। আপনিও ত তাই।

রা। আমার কিছু বিষয় আছে। নিজে তাহার তত্ত্বাবধান করি। সুতরাং সকলের সম্মুখেই আমাকে বাহির হইতে হয়। আমি কাহারও অধীন নই। সে তাহার স্বামীর অধীন, স্বামীর অনুমতি ব্যতীত—

দে। স্বামী ?

রা। হাঁ, আশ্চর্য্য হলেন যে ?

দে। বিবাহিতা ?

রা। হিন্দুর মেয়ে—উনিশ বৎসর বয়স, বিবাহিতা নহে ?

দেবেন্দ্রনারায়ণ অনেকক্ষণ মাথায় হাত দিয়া রহিলেন। রাধারাণী বলিলেন, "কেন, আপনি কি তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন ?"

দে। মানুষ কি না ইচ্ছা করে ?

রা। এরূপ ইচ্ছা রাণীজি জানিতে পারিয়াছেন কি ?

দে। রাণীজি কেহ ইহার ভিতর নাই। রাধারাণীর সাক্ষাতের অনেক পূর্ব্বেই আমার পত্নীবিয়োগ হইয়াছে।

রাধারাণী আবার যুক্তকরে ভাবিল, "জয় জগদীশ্বর! আর ক্ষণকাল যেন আমার এমনই সাহস থাকে।" প্রকাশ্যে বলিল, "তা শুনিলেন ত, রাধারাণী পরস্ত্রী। এখনও কি তাহার দর্শন অভিলাষ করেন ?"

দে। করি বৈ কি।

রা। সে কথাটা কি আপনার যোগ্য ?

দে। রাধারাণী আমার সন্ধান করিয়াছিল কেন, তাহা এখনও জানা হয় নাই।

রা। আপনি রাধারাণীকে যাহা দিয়াছিলেন, তাহা পরিশোধ করিবে বলিয়া। আপনি শোধ লইবেন কি ?

দেবেন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "যা দিয়াছি, তাহা পাইলে লইতে পারি।"

রা। কি কি দিয়াছেন ?

দে। একখানা নোট।

রা। এই নিন।

বলিয়া রাধারাণী আঁচল হইতে সেই নোটখানি খুলিয়া দেবেন্দ্রনারায়ণের হাতে দিলেন। দেবেন্দ্রনারায়ণ দেখিলেন, তাঁহার হাতে লেখা রাধারাণীর নাম সে নোটে আছে। দেখিয়া বলিলেন, "এ নোট কি রাধারাণীর স্বামী কখনও দেখিয়াছেন?"

রা। রাধারাণী কুমারী। স্বামীর কথাটা আপনাকে মিথ্যা বলিয়াছিলাম।

দে। তা সব ত শোধ হইল না।

রা। আর কি বাকি।

দে। দুইটি টাকা আর কাপড়।

রা। সব ঋণ যদি এখন পরিশোধ হয়, তবে আপনি আহার না করিয়া চলিয়া যাইবেন। পাওনা বুঝিয়া পাইলে কোন্ মহাজন বসে? ঋণের সে অংশ ভোজনের পর রাধারাণী পরিশোধ করিবে।

দে। আমার যে এখনও অনেক পাওনা বাকি।

রা। আবার কি?

দে। রাধারাণীকে মন-প্রাণ দিয়াছি—তা ত পাই নাই।

রা। অনেক দিন পাইয়াছেন। রাধারাণীর মন-প্রাণ আপনি অনেক দিন লইয়াছেন—তা সে দেনাটা শোধ-বোধ গিয়াছে।

দে। সুদ কিছু পাই না?

রা। পাইবেন বৈ কি?

দে। কি পাইব?

রা। শুভলগ্নে সুতহিবুকযোগে এই অধম নারীদেহ আপনাকে দিয়া, রাধারাণী ঋণ হইতে মুক্ত হইবে।

এই বলিয়া রাধারাণী ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

রাধারাণীর আজ্ঞা পাইয়া, দেওয়ানজী আসিয়া রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণকে বহির্ব্বাটীতে লইয়া গিয়া যথেষ্ট সমাদর করিলেন। যথাবিহিত সময়ে রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ ভোজন করিলেন। রাধারাণী স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাকে ভোজন করাইলেন। ভোজনান্তে রাধারাণী বলিলেন, "আপনার নগদ দুইটি টাকা ও কাপড় এখনও ধারি। কাপড় পরিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছি; টাকা খরচ করিয়াছি। আর ফেরত দিবার উপায় নাই। তাহার বদলে যাহা আপনার জন্য রাখিয়াছি, তাহা গ্রহণ করুন।"

এই বলিয়া রাধারাণী বহুমূল্য হীরকহার বাহির করিয়া দেবেন্দ্রের গলায় পরাইয়া দিতে গেলেন্। দেবেন্দ্রনারায়ণ নিষেধ করিয়া বলিলেন, "যদি ঐরূপে দেনা পরিশোধ করিবে, তবে তোমার গলায় যে ছড়া আছে, তাহাই লইব।"

রাধারাণী হাসিতে হাসিতে আপনার গলার হার খুলিয়া দেবেন্দ্রনারায়ণের গলায় পরাইল। তখন দেবেন্দ্রনারায়ণ বলিলেন, "সব শোধ হইল—কিন্তু আমি একটু ঋণী রহিলাম।"

রাধা। কিসে?

দে। সে দুই পয়সার ফুলের মালার মূল্য ত ফেরত পাইলাম। তবে এখন মালা ফেরত দিতে আমি বাধ্য।

রাধারাণী হাসিল।

দেবেন্দ্রনারায়ণ ইচ্ছাপূর্ব্বক মুক্তাহার পরিয়া আসিয়াছিলেন, তাহা রাধারাণীর কণ্ঠে পরাইয়া দিয়া বলিলেন, "এই ফেরৎ দিলাম।"

এমন সময়ে পোঁ করিয়া শাঁক বাজিল।

রাধারাণী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "শাঁক বাজাইল কে?"

তাঁহার একজন দাসী চিত্রা উত্তর করিল, "আজ্ঞা, আমি।"

রাধারাণী জিজ্ঞাসা করিল, "কেন বাজাইলি?"

চিত্রা বলিল, "কিছু পাইব বলিয়া।"

বলা বাহুল্য যে, চিত্রা পুরস্কৃত হইল। কিন্তু তাহার কথাটা মিথ্যা। রাধারাণী তাহাকে শিখাইয়া পড়াইয়া দ্বারের নিকট বসাইয়া আসিয়াছিল।

তারপর দুইজনে বিরলে বসিয়া মনের কথা হইল। রাধারাণী দেবেন্দ্রনারায়ণের বিস্ময় দূর করিবার জন্য সেই রথের দিনের সাক্ষাতের পর যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহার পিতামহের বিষয়-সম্পত্তির কথা, তজ্জন্য রাধারাণীর মা'র দৈন্যের কথা, মা'র মৃত্যুর কথা, প্রিভিকৌন্সিলের ডিক্রীর কথা, কামাখ্যাবাবুর মৃত্যুর কথা, সব বলিল। বসন্তের কথা বলিল, আপনার বিজ্ঞাপনের কথা বলিল। কাঁদিতে কাঁদিতে, হাসিতে হাসিতে, বৃষ্টি-বিদ্যুতে, চাতকা চিরসঞ্চিত প্রণয়-সম্ভাষণ-পিপাসা পরিতৃপ্ত করিল। নিদাঘসন্তপ্ত পর্ব্বত যেমন বর্ষার বারিধারা পাইয়া শীতল হয়, দেবেন্দ্রনারায়ণও তেমনি শীতল হইলেন।

তিনি রাধারাণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার ত কেহ নাই। কিন্তু এ বাড়ী বড় জনাকীর্ণ দেখিতেছি।"

রাধারাণী বলিল, "দুঃখের দিনে আমার কেহ ছিল না। এখন আমার অনেক

আত্মীয়কুটুম্ব জুটিয়াছে। আমি এ অল্পবয়সে একা থাকিতে পারি না, এ জন্য যত্ন করিয়া তাহাদিগকে স্থান দিয়া রাখিয়াছি।"

দে। তাঁহাদের মধ্যে এমন সম্বন্ধবিশিষ্ট কেহ আছে যে, তোমাকে এই দীন দরিদ্রকে দান করিতে পারে ?

রা। তাও আছে।

দে। তবে তিনি কেন সেই শুভলগ্ন স্থতহিবুকযোগটা খুঁজুন না ?

রা। বোধ করি, এতক্ষণ সে কাজটা হইয়া গেল। তোমার সহিত রাধারাণীর এরূপ সাক্ষাৎ অন্য কোন কারণে হইতে পারে না, এ পুরীতে সকলেই জানে। সংবাদ লইব কি ?

দে। বিলম্বে কাজ কি ?

রাধারাণী ডাকিল, "চিত্রে!" চিত্রা আসিল। রাধারাণী জিজ্ঞাসা করিল, "দিন-টিন কিছু হইল কি ?"

চিত্রা বলিল, "হাঁ, দেওয়ানজী মহাশয় পুরোহিত মহাশয়কে ডাকিয়াছিলেন। পুরোহিত পরদিন বিবাহের উত্তম দিন বলিয়া গিয়াছেন। দেওয়ানজী মহাশয় সমস্ত উদ্যোগ করিতেছেন।"

তখন বসন্ত আসিল, কামাখ্যাবাবুর পুত্রেরা এবং পরিবারবর্গ সকলেই আসিল, আর যত বসন্তের কোকিল, সময়ের বন্ধু, যে যেখানে ছিল, সকলেই আসিল। দেবেন্দ্রনারায়ণের বন্ধু ও অনুচরবর্গ সকলে আসিল।

বসন্ত আসিলে রাধারাণী বলিল, "কি আক্কেল ভাই বসন্ত ?"

বসন্ত। কেন ?

রা। যাকে তাকে তুমি পত্র দিয়া পাঠাইয়া দাও কেন ?

বসন্ত। কেন, লোকটা কি করেছে বল দেখি।

রাধারাণী তখন সকল বলিল। বসন্ত বলিল, "রাগের কথা ত বটে। সুদ সুদ্ধ দেনাপাওনা বুঝিয়া নেয়, এমন মহাজনকে যে বাড়ী চিনাইয়া দেয়, তাহার উপর রাগের কথাটা বটে!"

রাধারাণী বলিল, "তাই আজ আমি তোর গলায় দড়ি দিব।"

এই বলিয়া রাধারাণী যে হীরকহার রুক্মিণীকুমারকে পরাইতে গিয়াছিলেন, তাহা আনিয়া বসন্তের গলায় পরাইয়া দিলেন।

তারপর শুভলগ্নে শুভবিবাহ হইয়া গেল।

সমাপ্ত

যুগলাঙ্গুরীয়

ভূমিকা

বঙ্কিমচন্দ্রের কথা-সাহিত্য রচনার দীক্ষা ইংরাজি কথা-সাহিত্য হইতে, এ বিষয়ে কোন দ্বিধা নাই। এ দেশে যে কথা-কাহিনী রচনার ধারা প্রচলিত ছিল, বঙ্কিম সে ধারার অনুসরণ করেন নাই। তাহা করিলে আমরা ছোট বড় অনেকগুলি যুগলাঙ্গুরীয় পাইতাম, কপালকুণ্ডলা, চন্দ্রশেখর ইত্যাদি পাইতাম না। ইংরাজি হইতে তিনি রস-সৃষ্টির আদর্শ, বহু উপকরণ—এমন কি কিছু কিছু উপাদানও গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু এদেশে প্রচলিত উপকথকতার বাচনভঙ্গী একেবারে বর্জ্জন করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। যুগলাঙ্গুরীয় সেই দেশীয় বাচনভঙ্গীর ধারার সহিত তাঁহার রচিত রোমান্সগুলির যোগ-সূত্র। ইংরাজি সাহিত্যের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত কোন রচনা যদি বঙ্কিমচন্দ্রের থাকে তবে তাহা এই যুগলাঙ্গুরীয়।

যুগলাঙ্গুরীয়ের কাহিনীটি অনেকটা বেতাল পঞ্চবিংশতি, কথাসরিৎসাগর বা বৃহৎকথার কাহিনীর মতই। গল্পের উপাদান, উপকরণ ও আবেষ্টনী কেবল প্রাচীন যুগের নয়, গল্প বলিবার ঢঙটিও প্রাচীন যুগের উপযোগী। ইহাকে কোন সংস্কৃত উপাখ্যান বা কাহিনীর অনুবাদ বলিয়াই মনে হইতে পারে।

যে যুগে জ্যোতিষ গণনাকে ধ্রুব সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা হইত এবং সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী গুরু ধনী গৃহস্থদের ও গার্হস্থ্য জীবনকে অনুশাসনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিত, সেই যুগের সহিত বর্ত্তমান যুগের লৌকিক জীবনের কোন যোগ নাই। বঙ্কিম সীতারাম পর্য্যন্ত সেই যুগের ধারাকে অনেকটা টানিয়া আনিয়াছেন।

প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যের সঙ্গেও যুগলাঙ্গুরীয়ের একটা ক্ষীণ যোগসূত্র পাওয়া যায়। গল্পের ঘটনাস্থান বাণিজ্যসমৃদ্ধ বঙ্গদেশের তাম্রলিপ্ত বন্দর। প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্য-কাহিনীর মত এই গল্পে বণিক জাতির সভ্যতা ও প্রাধান্যের কথা আছে এবং গল্পের নায়ক পুরন্দর শ্রীমন্তের মত সিংহলে বাণিজ্য যাত্রা করিতেছে।

যুগলাঙ্গুরীয়ের কথাবস্তু ও বাচনভঙ্গী প্রাচীন রীতির হইলেও বাঙ্গালা দেশে ইহা হইতেই ছোট গল্পের সূত্রপাত বলা যাইতে পারে। গল্পটির আকার ছোট বলিয়া একথা বলিতেছি না। আমাদের পুরাতন গল্প-কাহিনীতে যে সব আজগুবি কল্পনার লীলা থাকিত, যে সব অতি-প্রাকৃত ব্যাপারের সমাবেশ থাকিত, ইহাতে

সে সমস্ত নাই। ইহার কথাবস্তু অবাস্তব, নীতিপ্রচারমূলক বা ধর্ম্মমূলক নয়। যথেষ্ট না হইলেও ইহাতে Humanism আছে, প্লটের বৈচিত্র্য ও জটিলতা আছে, প্লটটি নেহাৎ Conventional নয়, অবিশ্বাস্য ব্যাপার কিছুই নাই, বরং বিশ্বাস্যতা সৃষ্টির যথেষ্ট প্রয়াস আছে। তাহা ছাড়া দৈববিধান এড়াইবার জন্য অঙ্গুরীর ব্যাপার লইয়া যে সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে এবং তাহার সমাধানে যে অপ্রত্যাশিত চমক-সৃষ্টির চেষ্টা দেখা যায়, তাহাতে ইহাকে এদেশের ছোটগল্পের সুপ্রভাতের আগে শুকতারা বলিতে পারা যায়।

শ্রীকালিদাস রায়

১২ই, শ্রাবণ, সন ১৩৫৬,
টালিগঞ্জ।



যুগলাঙ্গুরীয়



প্রথম পরিচ্ছেদ

দুই জনে উদ্যানমধ্যে লতামণ্ডপতলে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তখন প্রাচীন নগর তাম্রলিপ্তের * চরণ ধৌত করিয়া অনন্ত নীল সমুদ্র মৃদু মৃদু নিনাদ করিতেছিল।

তাম্রলিপ্ত নগরের প্রান্তভাগে সমুদ্রতীরে এক বিচিত্র অট্টালিকা ছিল। তাহার নিকট একটি সুনির্ম্মিত বৃক্ষবাটিকার অধিকারী ধনদাস নামক একজন শ্রেষ্ঠী। শ্রেষ্ঠীর কন্যা হিরণ্ময়ী লতামণ্ডপে দাঁড়াইয়া এক যুবা পুরুষের সঙ্গে কথা কহিতেছিলেন।

হিরণ্ময়ী বিবাহের বয়স অতিক্রম করিয়াছিলেন। তিনি ঈপ্সিত স্বামীর কামনায় একাদশ বৎসরে আরম্ভ করিয়া ক্রমাগত পঞ্চ বৎসর এই সমুদ্রতীর-বাসিনী

---

* আধুনিক তমলুক। পুরাবৃত্তে পাওয়া যায় যে, পূর্ব্বকালে এই নগরী সমুদ্রতীরবর্ত্তী ছিল।

সাগরেশ্বরী নাম্নী দেবীর পূজা করিয়াছিলেন, কিন্তু মনোরথ সফল হয় নাই। প্রাপ্তযৌবনা কুমারী কেন যে এই যুবার সঙ্গে একা কথা কহেন, তাহা সকলেই জানিত। হিরণ্ময়ী যখন চারি বৎসরের বালিকা, তখন এই যুবার বয়ঃক্রম আট বৎসর। ইঁহার পিতা শচীসুত শ্রেষ্ঠী ধনদাসের প্রতিবাসী, এ জন্য উভয়ে একত্রে বাল্যক্রীড়া করিতেন; হয় শচীসুতের গৃহে, নয় ধনদাসের গৃহে সর্ব্বদা একত্রে সহবাস করিতেন। এক্ষণে যুবতীর বয়স ষোড়শ, যুবার বয়স বিংশতি বৎসর, তথাপি উভয়ের সেই বালসখিত্ব সম্বন্ধই ছিল, একটুমাত্র বিঘ্ন ঘটিয়াছিল। যথাবিহিত কালে উভয়ের পিতা, এই যুবক-যুবতীর পরস্পরের সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধ করিয়াছিলেন। বিবাহের দিন স্থির পর্য্যন্ত হইয়াছিল। অকস্মাৎ হিরণ্ময়ীর পিতা বলিলেন, "আমি বিবাহ দিব না।" সেই অবধি হিরণ্ময়ী আর পুরন্দরের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন না। অদ্য পুরন্দর অনেক বিনয় করিয়া বিশেষ কথা আছে বলিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া আনিয়াছিলেন। লতামণ্ডপতলে আসিয়া হিরণ্ময়ী কহিলেন, "আমাকে কেন ডাকিয়া আনিলে? আমি এক্ষণে আর বালিকা নহি। এখন আর তোমার সঙ্গে এমত স্থলে একা সাক্ষাৎ করা ভাল দেখায় না, আর ডাকিলে আমি আসিব না।"

ষোল বৎসরের বালিকা বলিতেছে, 'আমি আর বালিকা নহি', ইহা বড় মিষ্ট কথা। কিন্তু সে রস অনুভব করিবার লোক সেখানে কেহই ছিল না। পুরন্দরের বয়স বা মনের ভাব সেরূপ নহে।

পুরন্দর মণ্ডপবিলম্বিত লতা হইতে একটি পুষ্প ভাঙ্গিয়া লইয়া ছিন্ন করিতে করিতে বলিলেন, "আমি আর ডাকিব না। আমি দূরদেশে চলিলাম। তাই তোমাকে বলিয়া যাইতে আসিয়াছি।"

হি। দূরদেশে? কোথায়?

পু। সিংহলে।

হি। সিংহলে? সে কি? কেন সিংহলে যাইবে?

পু। "কেন যাইব? আমরা শ্রেষ্ঠী, বাণিজ্যার্থ যাইব।"—বলিতে বলিতে পুরন্দরের চক্ষু ছল-ছল করিয়া আসিল।

হিরণ্ময়ী বিমনা হইলেন; কোন কথা কহিলেন না, অনিমেষলোচনে সম্মুখ-বর্ত্তী সাগর-তরঙ্গে সূর্য্য-কিরণের ক্রীড়া দেখিতে লাগিলেন। প্রাতঃকাল, মৃদুপবন বহিতেছে। মৃদুলপবনোত্থিত অতুঙ্গ তরঙ্গে বালারুণরশ্মি আরোহণ করিয়া কাঁপিতেছে—সাগর-জলে তাহার অনন্ত উজ্জ্বল রেখা প্রসারিত হইয়াছে—

শ্যামাঙ্গীর অঙ্গে রজতালঙ্কারবৎ ফেননিচয় শোভিতেছে, তীরে জলচর পক্ষিকুল শ্বেতরেখা সাজাইয়া বেড়াইতেছে।

হিরণ্ময়ী সব দেখিলেন ;—নীল জল দেখিলেন, তরঙ্গশিরে ফেনমালা দেখিলেন, সূর্য্যরশ্মির ক্রীড়া দেখিলেন, দূরবর্ত্তী অর্ণবপোত দেখিলেন, নীলাম্বরে কৃষ্ণবিন্দুবৎ একটি পক্ষী উড়িতেছে, তাহাও দেখিলেন। শেষে ভূতলশায়ী একটি শুষ্ক কুসুমের প্রতি দৃষ্টি করিতে করিতে কহিলেন, "তুমি কেন যাবে, অন্যান্য বার তোমার পিতা যাইয়া থাকেন।"

পুরন্দর বলিলেন, "আমার পিতা বৃদ্ধ হইতেছেন। আমার এখন অর্থোপার্জ্জনের সময় হইয়াছে। আমি পিতার অনুমতি পাইয়াছি।"

হিরণ্ময়ী লতামণ্ডপের কাষ্ঠে ললাট রক্ষা করিলেন, পুরন্দর দেখিলেন, তাঁহার ললাট কুঞ্চিত হইতেছে, অধর স্ফুরিত হইতেছে, নাসিকারন্ধ্র স্ফীত হইতেছে। দেখিলেন যে, হিরণ্ময়ী কাঁদিয়া ফেলিলেন।

পুরন্দর মুখ ফিরাইলেন। তিনিও একবার আকাশ, পৃথিবী, নগর, সমুদ্র, সকল দেখিলেন, কিন্তু কিছুতেই রহিল না—চক্ষুর জল গণ্ড বহিয়া পড়িল। পুরন্দর চক্ষু মুছিয়া বলিলেন, "এই কথা বলিবার জন্য আসিয়াছি। যে দিন তোমার পিতা বলিলেন, কিছুতেই আমার সঙ্গে তোমার বিবাহ দিবেন না, সেই দিন হইতে আমি সিংহলে যাইবার কল্পনা স্থির করিয়াছিলাম। ইচ্ছা আছে যে, সিংহল হইতে ফিরিব না। যদি কখন তোমায় ভুলিতে পারি, তবেই ফিরিব। আমি অধিক কথা বলিতে জানি না, তুমিও অধিক কথা বুঝিতে পারিবে না, ইহাতে বুঝিতে পারিবে যে, আমার পক্ষে জগৎ-সংসার এক দিকে, তুমি এক দিকে হইলে জগৎ তোমার তুল্য নহে।" এই বলিয়া পুরন্দর হঠাৎ পশ্চাৎ ফিরিয়া পদচারণ করিয়া অন্য একটা বৃক্ষের পাতা ছিঁড়িলেন। অশ্রুবেগ কিঞ্চিৎ শমিত হইলে, ফিরিয়া আসিয়া আবার কহিলেন, "তুমি আমায় ভালবাস, তাহা জানি। কিন্তু যবে হউক, তুমি অন্যের পত্নী হইবে। অতএব তুমি আর আমায় মনে রাখিও না। তোমার সঙ্গে যেন এ জন্মে আমার আর সাক্ষাৎ না হয়।"

এই বলিয়া পুরন্দর বেগে প্রস্থান করিলেন। হিরণ্ময়ী বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। রোদন সংবরণ করিয়া একবার ভাবিলেন, 'আমি যদি মরি, তবে কি পুরন্দর সিংহলে যাইতে পারে? আমি কেন গলায় লতা বাঁধিয়া মরি না, কিংবা সমুদ্রে ঝাঁপ দিই না?' আবার ভাবিলেন, 'যাক্ না যাক্, তাতে আমার কি?' এই ভাবিয়া হিরণ্ময়ী আবার কাঁদিতে বসিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কেন যে ধনদাস বলিয়াছিলেন যে, 'আমি পুরন্দরের সহিত হিরণের বিবাহ দিব না,' তাহা কেহ জানিত না। তিনি তাহা কাহারও সাক্ষাতে প্রকাশ করেন নাই। জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, "বিশেষ কারণ আছে।" হিরণ্ময়ীর অন্যান্য অনেক সম্বন্ধ আসিল, কিন্তু ধনদাস কোন সম্বন্ধেই সম্মত হইলেন না। বিবাহের কথামাত্রে কর্ণপাত করিতেন না। "কন্যা বড় হইল" বলিয়া গৃহিণী তিরস্কার করিতেন, ধনদাস শুনিতেন না; কেবল বলিতেন, "গুরুদেব আসুন, তিনি আসিলে এ কথা হইবে।"

পুরন্দর সিংহল গেলেন। তাঁহার সিংহলযাত্রার পর দুই বৎসর এইরূপে গেল। পুরন্দর ফিরিলেন না। হিরণ্ময়ীর কোন সম্বন্ধ হইল না। হিরণ অষ্টাদশ বৎসরের হইয়া উদ্যানমধ্যস্থ নবপল্লবিত চূতবৃক্ষের ন্যায় ধনদাসের গৃহ শোভা করিতে লাগিলেন।

হিরণ্ময়ী ইহাতে দুঃখিত হয়েন নাই। বিবাহের কথা হইলে পুরন্দরকে মনে পড়িত; তাঁহার সেই ফুল্লকুসুমমালামণ্ডিত, কুঞ্চিত-কৃষ্ণ-কুন্তলাবলীবেষ্টিত সহাস্য মুখমণ্ডল মনে পড়িত; তাঁহার সেই দ্বিরদরদশুভ্র স্কন্ধদেশে স্বর্ণপুষ্প শোভিত নীল উত্তরীয় মনে পড়িত; পদ্মহস্তে হীরকাঙ্গুরীয়গুলি মনে পড়িত; হিরণ্ময়ী কাঁদিতেন। পিতার আজ্ঞা হইলে যাহাকে তাহাকে বিবাহ করিতে হইত, কিন্তু সে জীবন্মৃত্যুবৎ হইত। তবে তাঁহার বিবাহোদ্যোগে পিতাকে অপ্রবৃত্ত দেখিয়া, আহ্লাদিত হউন বা না হউন, বিস্মিতা হইতেন। লোকে এত বয়স অবধি কন্যা অবিবাহিতা রাখে না—রাখিলেও তাহার সম্বন্ধ করে। তাঁহার পিতা সে কথায় কর্ণ পর্য্যন্তও দেন না কেন? এক দিন অকস্মাৎ এ বিষয়ে কিছু সন্ধান পাইলেন।

ধনদাস বাণিজ্য হেতু চীনদেশে নির্ম্মিতা একটি বিচিত্র কৌটা পাইয়াছিলেন। কৌটা অতি বৃহৎ—ধনদাসের পত্নী তাহাতে অলঙ্কার রাখিতেন। ধনদাস কতকগুলি নূতন অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া পত্নীকে উপহার দিলেন। শ্রেষ্ঠীপত্নী পুরাতন অলঙ্কারগুলি কৌটাসমেত কন্যাকে দিলেন। অলঙ্কারগুলি রাখা-ঢাকা করিতে হিরণ্ময়ী দেখিলেন যে, তাহাতে একখানি ছিন্ন লিপির অর্দ্ধাবশেষ রহিয়াছে।

হিরণ্ময়ী পড়িতে জানিতেন। তাহাতে প্রথমেই নিজের নাম দেখিতে পাইয়া কৌতূহলাবিষ্ট হইলেন। পড়িয়া দেখিলেন যে, যে অর্দ্ধাংশ আছে, তাহাতে

কোন অর্থবোধ হয় না। কে কাহাকে লিখিয়াছিল, তাহাও কিছুই বুঝা গেল না। কিন্তু তথাপি তাহা পড়িয়া হিরণ্ময়ীর ভীতি-সঞ্চার হইল। ছিন্ন পত্রখণ্ড এইরূপ ঃ—

"জ্যোতিষী গণনা করিয়া দেখিলা
হিরণ্ময়ী তুল্য সোনার পুত্তলি
বাহ হইলে ভয়ানক বিপদ।
সর্ মুখ পরস্পরে।

হিরণ্ময়ী কোন অজ্ঞাত বিপদ আশঙ্কা করিয়া অত্যন্ত ভীতা হইলেন। কাহাকে কিছু না বলিয়া পত্রখণ্ড তুলিয়া রাখিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দুই বৎসরের পর আরও এক বৎসর গেল। তথাপি পুরন্দরের সিংহল হইতে আসার কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। কিন্তু হিরণ্ময়ীর হৃদয়ে তাঁহার মূর্ত্তি পূর্ব্ববৎ উজ্জ্বল ছিল। তিনি মনে মনে বুঝিলেন যে, পুরন্দরও তাঁহাকে ভুলিতে পারেন নাই—নচেৎ এত দিন ফিরিতেন।

এইরূপে দুই আর একে তিন বৎসর গেলে অকস্মাৎ এক দিন ধনদাস বলিলেন যে, "চল, সপরিবারে কাশী যাইব। গুরুদেবের নিকট হইতে তাঁহার শিষ্য আসিয়াছেন। গুরুদেব সে স্থানে যাইতে অনুমতি করিয়াছেন। তথায় হিরণ্ময়ীর বিবাহ হইবে। সেইখানে তিনি পাত্র স্থির করিয়াছেন।"

ধনদাস পত্নী ও কন্যাকে লইয়া কাশীযাত্রা করিলেন। উপযুক্ত কালে কাশীতে উপনীত হইলে পর ধনদাসের গুরু আনন্দ স্বামী আসিয়া সাক্ষাৎ করিলেন এবং বিবাহের দিন স্থির করিয়া যথাশাস্ত্র উদ্যোগ করিতে বলিয়া গেলেন।

বিবাহের যথাশাস্ত্র উদ্যোগ হইল; কিন্তু ঘটা কিছুই হইল না, ধনদাসের পরিবারস্থ ব্যক্তি ভিন্ন কেহই জানিতে পারিল না যে, বিবাহ উপস্থিত। কেবল শাস্ত্রীয় আচার সকল রক্ষা করা হইল মাত্র।

বিবাহের দিন উত্তীর্ণ হইল—এক প্রহর রাত্রে লগ্ন, তথাপি গৃহে সচরাচর যাহারা থাকে, তাহারা ভিন্ন আর কেহই নাই। প্রতিবাসীরাও কেহ উপস্থিত নাই। এ পর্য্যন্ত ধনদাস ব্যতীত গৃহস্থ কেহই জানে না যে, কে পাত্র—কোথাকার পাত্র। তবে সকলেই জানিত যে, যেখানে আনন্দ স্বামী বিবাহের

সম্বন্ধ করিয়াছেন, সেখানে কখন অপাত্র স্থির করেন নাই। তিনি যে কেন পাত্রের পরিচয় ব্যক্ত করিলেন না, তাহা তিনিই জানেন—তাঁহার মনের কথা বুঝিবে কে? একটি গৃহে পুরোহিত সম্প্রদানের উদ্যোগাদি করিয়া একাকী বসিয়া আছেন। বাহিরে ধনদাস একাকী বরের প্রতীক্ষা করিতেছেন। অন্তঃপুরে কন্যা-সজ্জা করিয়া হিরণ্ময়ী বসিয়া আছেন—আর কোথাও কেহ নাই। হিরণ্ময়ী মনে মনে ভাবিতেছেন, 'এ কি রহস্য! কিন্তু পুরন্দরের সঙ্গে যদি বিবাহ না হইল—তবে যে হয়, তাহার সঙ্গে বিবাহ হউক—সে আমার স্বামী হইবে না।'

এমন সময় ধনদাস কন্যাকে ডাকিয়া আসিলেন। কিন্তু তাঁহাকে সম্প্রদানের স্থানে লইয়া যাইবার পূর্ব্বে বস্ত্রের দ্বারা তাঁহার দুই চক্ষু দৃঢ়তর বাঁধিলেন। হিরণ্ময়ী কহিলেন, "এ কি পিতা?" ধনদাস কহিলেন, "গুরুদেবের আজ্ঞা, তুমিও আমাদের আজ্ঞামত কার্য্য কর। মন্ত্রগুলি মনে মনে বলিও।" শুনিয়া হিরণ্ময়ী কোন কথা কহিলেন না। ধনদাস দৃষ্টিহীনা কন্যার হস্ত ধরিয়া সম্প্রদানের স্থানে লইয়া গেলেন।

হিরণ্ময়ী তথায় উপনীত হইয়া যদি কিছু দেখিতে পাইতেন, তাহা হইলে দেখিতেন যে, পাত্রও তাঁহার ন্যায় আবৃতনয়ন। এইরূপে বিবাহ হইল। সে স্থানে গুরু, পুরোহিত এবং কন্যাকর্ত্তা ভিন্ন আর কেহ ছিল না। বর-কন্যা কেহ কাহাকে দেখিলেন না, শুভদৃষ্টি হইল না।

সম্প্রদানান্তে আনন্দ স্বামী বর-কন্যাকে কহিলেন যে, "তোমাদিগের বিবাহ হইল, কিন্তু তোমরা পরস্পরকে দেখিলে না। কন্যার কুমারী নাম ঘুচানই এই বিবাহের উদ্দেশ্য, ইহজন্মে কখন তোমাদের পরস্পরের সাক্ষাৎ হইবে কি না, বলিতে পারি না। যদি হয়, তবে কেহ কাহাকে চিনিতে পারিবে না। চিনিবার আমি একটি উপায় করিয়া দিতেছি। আমার হাতে দুইটি অঙ্গুরীয় আছে। দুইটি ঠিক এক প্রকার। অঙ্গুরীয় যে প্রস্তরে নির্ম্মিত, তাহা পাওয়া যায় না এবং অঙ্গুরীয়ের ভিতরের পৃষ্ঠে একটি ময়ূর অঙ্কিত আছে। ইহার একটি বরকে, একটি কন্যাকে দিলাম। এরূপ অঙ্গুরীয় অন্য কেহ পাইবে না—বিশেষ এই ময়ূরের চিত্র অননুকরণীয়, ইহা আমার স্বহস্তে ক্ষোদিত। যদি কন্যা কোন পুরুষের হস্তে এইরূপ অঙ্গুরীয় দেখেন, তবে জানিবেন যে, সেই পুরুষ তাঁহার স্বামী; যদি বর কখন কোন স্ত্রীলোকের হস্তে এইরূপ অঙ্গুরীয় দেখেন, তবে জানিবেন যে, তিনি তাঁহার পত্নী। তোমরা কেহ এ অঙ্গুরীয় হারাইও না বা কাহাকেও দিও না,

অন্নাভাব হইলেও বিক্রয় করিও না। কিন্তু ইহাও আজ্ঞা করিতেছি যে, অদ্য হইতে পঞ্চ বৎসরমধ্যে কদাচ এই অঙ্গুরীয় পরিও না। অদ্য আষাঢ় মাসের শুক্লা পঞ্চমীর রাত্রি একাদশ দণ্ড হইয়াছে, ইহার পর পঞ্চম আষাঢ়ের শুক্লা পঞ্চমীর একাদশ দণ্ড রাত্রি পর্য্যন্ত অঙ্গুরীয় ব্যবহার নিষেধ করিলাম। আমার নিষেধ অবহেলা করিলে গুরুতর অমঙ্গল হইবে।”

এই বলিয়া আনন্দ স্বামী বিদায় হইলেন। ধনদাস কন্যার চক্ষুর বন্ধন মোচন করিলেন। হিরণ্ময়ী চাহিয়া দেখিলেন যে, গৃহমধ্যে কেবল পিতা ও পুরোহিত আছেন—তাঁহার স্বামী নাই। তাঁহার বিবাহ-রাত্রি একাই যাপন করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিবাহান্তে ধনদাস স্ত্রী ও কন্যাকে লইয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন। আরও চারি বৎসর অতিবাহিত হইল। পুরন্দর ফিরিয়া আসিলেন না—হিরণ্ময়ীর পক্ষে এখন ফিরিলেই কি, না ফিরিলেই কি?

পুরন্দর এই যে সাত বৎসর ফিরিল না, ইহা ভাবিয়া হিরণ্ময়ী দুঃখিতা হইলেন। মনে ভাবিলেন, “তিনি যে আজও আমায় ভুলিতে পারেন নাই বলিয়া আসিলেন না, এমত কদাচ সম্ভবে না। তিনি জীবিত আছেন কি না সংশয়। তাঁহার দেখার আমি কামনা করি না, এখন আমি অন্যের স্ত্রী, কিন্তু আমার বাল্যকালের সুহৃৎ বাঁচিয়া থাকুন, এ কামনা কেন না করিব?”

ধনদাসের কোন কারণে না কোন কারণে চিন্তিত ভাব প্রকাশ হইতে লাগিল, ক্রমে চিন্তা গুরুতর হইয়া শেষে দারুণ রোগে পরিণত হইল। তাহাতে তাঁহার মৃত্যু হইল। ধনদাসের পত্নী অনুমৃতা হইলেন। হিরণ্ময়ীর আর কেহ ছিল না। এ জন্য হিরণ্ময়ী মাতার চরণ ধারণ করিয়া অনেক রোদন করিয়া কহিলেন যে, “তুমি মরিও না।” কিন্তু শ্রেষ্ঠিপত্নী শুনিলেন না। তখন হিরণ্ময়ী পৃথিবীতে একাকিনী হইলেন।

মৃত্যুকালে হিরণ্ময়ীর মাতা তাঁহাকে বুঝাইয়াছিলেন যে, “বাছা, তোমার কিসের ভাবনা? তোমার এক জন স্বামী অবশ্য আছেন। নিয়মিত কাল অতীত হইলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলেও হইতে পারে। না হয়, তুমিও নিতান্ত বালিকা নহ। বিশেষ পৃথিবীতে যে সহায় প্রধান—ধন—তাহা তোমার অতুল পরিমাণে রহিল।”

কিন্তু সে আশা বিফল হইল—ধনদাসের মৃত্যুর পর দেখা গেল যে, তিনি কিছুই রাখিয়া যান নাই। অলঙ্কার, অট্টালিকা এবং গার্হস্থ্য সামগ্রী ভিন্ন আর কিছুই নাই। অনুসন্ধানে হিরণ্ময়ী জানিলেন যে, ধনদাস কয়েক বৎসর হইতে বাণিজ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া আসিতেছিলেন। তিনি তাহা কাহাকে না বলিয়া শোধনের চেষ্টায় ছিলেন। ইহাই তাঁহার চিন্তার কারণ। শেষে শোধন অসাধ্য হইল। ধনদাস মনের ক্লেশে পীড়িত হইয়া পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

এই সকল সংবাদ শুনিয়া অপরাপর শ্রেষ্ঠীরা আসিয়া হিরণ্ময়ীকে কহিল যে, "তোমার পিতা আমাদের ঋণগ্রস্ত হইয়া মরিয়াছেন। আমাদিগের ঋণ পরিশোধ কর।" শ্রেষ্ঠিকন্যা অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন যে, তাহাদের কথা যথার্থ। তখন হিরণ্ময়ী সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া তাহাদের ঋণ পরিশোধ করিলেন। বাসগৃহ পর্য্যন্ত বিক্রয় করিলেন।

এখন হিরণ্ময়ী অন্নবস্ত্রের দুঃখে দুঃখিনী হইয়া নগরপ্রান্তে এক কুটীরমধ্যে একা বাস করিতে লাগিলেন। কেবলমাত্র এক সহায় পরমহিতৈষী আনন্দ স্বামী, কিন্তু তিনি তখন দূরদেশে ছিলেন। হিরণ্ময়ীর এমন একটি লোক ছিল না যে, আনন্দ স্বামীর নিকট প্রেরণ করেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

হিরণ্ময়ী যুবতী এবং সুন্দরী—একাকিনী এক গৃহে শয়ন করা ভাল নহে। আপদ্‌ও আছে, কলঙ্কও আছে। অমলা নামে এক গোপকন্যা হিরণ্ময়ীর প্রতিবাসিনী ছিল। সে বিধবা, তাহার একটি কিশোরবয়স্ক পুত্র এবং কয়েকটি কন্যা। তাহার যৌবনকাল অতীত হইয়াছিল। সচ্চরিত্রা বলিয়া খ্যাতি ছিল। হিরণ্ময়ী রাত্রিতে আসিয়া তাহার গৃহে শয়ন করিতেন।

এক দিন হিরণ্ময়ী অমলার গৃহে শয়ন করিতে আসিলে পর অমলা তাঁহাকে কহিল, "সংবাদ শুনিয়াছ, পুরন্দর শ্রেষ্ঠী না কি আট বৎসরের পর নগরে ফিরিয়া আসিয়াছে?" শুনিয়া হিরণ্ময়ী মুখ ফিরাইলেন—চক্ষুর জল অমলা না দেখিতে পায়। পৃথিবীর সঙ্গে হিরণ্ময়ীর শেষ সম্বন্ধ ঘুচিল। পুরন্দর তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছে; নচেৎ ফিরিত না। পুরন্দর এক্ষণে মনে রাখুক বা ভুলুক, তাঁহার লাভ বা ক্ষতি কি? তথাপি যাহার স্নেহের কথা ভাবিয়া যাবজ্জীবন কাটাইয়াছেন, সে ভুলিয়াছে, ভাবিতে হিরণ্ময়ীর মনে কষ্ট হইল। হিরণ্ময়ী একবার ভাবিলেন—

"ভুলেন নাই, কত কাল আমার জন্য বিদেশে থাকিবেন ? বিশেষ তাহাতে তাঁহার পিতার মৃত্যু হইয়াছে, আর দেশে না আসিলে চলিবে কেন ?"—আবার ভাবিলেন, "আমি কুলটা সন্দেহ নাই—নহিলে পুরন্দরের কথা মনে করি কেন ?"

অমলা কহিল, "পুরন্দরকে কি তোমার মনে পড়িতেছে না ? পুরন্দর শচীসুত শ্রেষ্ঠীর ছেলে ?"

হি। চিনি।

অ। তা সে ফিরে এসেছে—কত নৌকা যে ধন এনেছে, তাহা গুণে সংখ্যা করা যায় না। এত ধন না কি এ তামলিপ্তে কেহ কখনও দেখে নাই।

হিরণ্ময়ীর হৃদয়ে রক্ত একটু খর বহিল। তাঁহার দারিদ্র্যদশা মনে পড়িল, পূর্ব্বসম্বন্ধও মনে পড়িল। দারিদ্র্যের জ্বালা বড় জ্বালা। তাহার পরিবর্ত্তে এই অতুল ধনরাশি হিরণ্ময়ীর হইতে পারিত, ইহা ভাবিয়া যাহার খর রক্ত না বহে, এমন স্ত্রীলোক অতি অল্প আছে। হিরণ্ময়ী ক্ষণেক কাল অন্যমনে থাকিয়া পরে অন্য প্রসঙ্গ তুলিলেন। শেষ শয়নকালে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অমলে, সেই শ্রেষ্ঠিপুত্রের বিবাহ হইয়াছে ?"

অমলা কহিল, "না, বিবাহ হয় নাই।"

হিরণ্ময়ীর ইন্দ্রিয় সকল অবশ হইল। সে রাত্রিতে আর কোন কথা হইল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পরে এক দিন অমলা হাসিমুখে হিরণ্ময়ীর নিকট আসিয়া মধুর ভর্ৎসনা করিয়া কহিল, "হ্যাঁ গ বাছা, তোমার কি এমনই ধর্ম্ম ?"

হিরণ্ময়ী কহিলেন, "কি করিয়াছি ?"

অম। আমার কাছে এত দিন তা বলিতে নাই ?

হি। কি বলি নাই ?

অম। পুরন্দর শ্রেষ্ঠীর সঙ্গে তোমার এত আত্মীয়তা।

হিরণ্ময়ী ঈষল্লজ্জিতা হইলেন, বলিলেন, "তিনি বাল্যকালে আমার প্রতিবাসী ছিলেন, তার বলিব কি ?"

অম। শুধু প্রতিবাসী ? দেখ দেখি, কি এনেছি ?

এই বলিয়া অমলা একটি কৌটা বাহির করিল; কৌটা খুলিয়া তাহার মধ্য হইতে অপূর্ব্বদর্শন, মহাপ্রভাযুক্ত মহামূল্য হীরার হার বাহির করিয়া হিরণ্ময়ীকে

দেখাইল। শ্রেষ্ঠিকন্যা হীরা চিনিত—বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "এ যে মহামূল্য—এ কোথায় পাইলে ?"

অম। ইহা তোমাকে পুরন্দর পাঠাইয়া দিয়াছে।

তুমি আমার গৃহে থাক শুনিয়া আমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়া ইহা তোমাকে দিতে বলিয়াছে।

হিরণ্ময়ী ভাবিয়া দেখিলেন, এই হার গ্রহণ করিলে চিরকালজন্য দারিদ্র্য-মোচন হয়। ধনদাসের আদরের কন্যা আর অন্নবস্ত্রের কষ্ট সহ্য করিতে পারিতেছিল না। অতএব হিরণ্ময়ী ক্ষণেক বিমনা হইয়া পরে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "অমলা, তুমি বণিককে কহিও যে, আমি ইহা গ্রহণ করিব না।"

অমলা বিস্মিত হইল। বলিল, "সে কি ? তুমি কি পাগল, না আমার কথা বিশ্বাস করিতেছ না ?"

হি। আমি তোমার কথা বিশ্বাস করিতেছি—আর পাগলও নই—আমি উহা গ্রহণ করিব না।

অমলা অনেক তিরস্কার করিতে লাগিল। হিরণ্ময়ী কিছুতেই গ্রহণ করিলেন না। তখন অমলা হার লইয়া মদনদেবের নিকটে গেল। রাজাকে প্রণাম করিয়া হার উপহার দিল। বলিল, "এ হার আপনাকে গ্রহণ করিতে হইবে। এ হার আপনারই যোগ্য।"

রাজা হার লইয়া অমলাকে যথেষ্ট অর্থ দিলেন। হিরণ্ময়ী ইহার কিছুই জানিল না।

ইহার কিছুদিন পরে পুরন্দরের এক জন পরিচারিকা হিরণ্ময়ীর নিকটে আসিল। সে কহিল, "আমার প্রভু বলিয়া পাঠাইলেন যে, আপনি যে পর্ণকুটীরে বাস করেন, ইহা তাঁহার সহ্য হয় না, আপনি তাঁহার বাল্যকালের সখী, আপনার গৃহ তাঁহার গৃহ একই ; তিনি এমন বলেন যে, আপনি তাঁহার গৃহে গিয়া বাস করুন, আপনার পিতৃগৃহ তিনি ধনদাসের মহাজনের নিকট ক্রয় করিয়াছেন। তাহা আপনাকে দান করিতেছেন, আপনি গিয়া সেইখানে বাস করুন, ইহাই তাঁহার ভিক্ষা।"

হিরণ্ময়ী দারিদ্র্য জন্য যত দুঃখ ভোগ করিতেছিলেন, তন্মধ্যে পিতৃভবন হইতে নির্ব্বাসনই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর বোধ হইত। যেখানে বাল্যক্রীড়া করিয়াছিলেন, যেখানে পিতামাতার সহ বাস করিতেন, যেখানে তাঁহাদিগের মৃত্যু দেখিয়াছেন, সেখানে যে আর বাস করিতে পান না, এ কষ্ট গুরুতর বোধ হইত।

সেই ভবনের কথায় তাঁহার চক্ষে জল আসিল। তিনি পরিচারিকাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "এ দান আমার গ্রহণ করা উচিত নহে—কিন্তু আমি এ লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। তোমার প্রভুর সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল হউক।"

পরিচারিকা প্রণাম করিয়া বিদায় হইল, অমলা উপস্থিত ছিল। হিরণ্ময়ী তাহাকে বলিলেন, "অমলা, তথায় আমার একা বাস করা হইতে পারে না। তুমি তথায় বাস করিবে চল।"

অমলা স্বীকৃতা হইল। উভয়ে গিয়া ধনদাসের গৃহে বাস করিতে লাগিলেন।

তথাপি অমলাকে সর্ব্বদা পুরন্দরের গৃহে যাইতে হিরণ্ময়ী এক দিন নিষেধ করিলেন, অমলা আর যাইত না।

পিতৃগৃহে গমনাবধি হিরণ্ময়ী একটা বিষয়ে বড় বিস্মিত হইলেন। এক দিন অমলা কহিল, "তুমি সংসারনির্ব্বাহের জন্য ব্যস্ত হইও না বা শারীরিক পরিশ্রম করিও না। রাজবাড়ীতে আমার কার্য্য হইয়াছে—আর এখন অর্থের আমার অভাব নাই। অতএব আমি সংসার চালাইব। তুমি সংসারে কর্ত্রী হইয়া থাক।"

হিরণ্ময়ী দেখিলেন, অমলার অর্থের বিলক্ষণ প্রাচুর্য্য। মনে মনে নানা প্রকার সন্দিহান হইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বিবাহের পর পঞ্চমাষাঢ়ের শুক্লা-পঞ্চমী আসিয়া উপস্থিত হইল। হিরণ্ময়ী এ কথা স্মরণ করিয়া সন্ধ্যাকালে বিমনা হইয়া বসিলেন। ভাবিতেছিলেন, "গুরুদেবের আজ্ঞানুসারে আমি কালি হইতে অঙ্গুরীয়টি পরিতে পারি। কিন্তু পরিব কি? পরিয়া আমার কি লাভ? হয় ত স্বামী পাইব, কিন্তু স্বামী পাইবার আমার বাসনা নাই। অথচ চিরকালের জন্য কেনই বা পরের মূর্ত্তি মনে আঁকিয়া রাখি? এ দুরন্ত হৃদয়কে শাসিত করাই উচিত। নইলে ধর্ম্মে পতিত হইতেছি!"

এমন সময় অমলা বিস্ময়বিহ্বলা হইয়া আসিয়া কহিল, "কি সর্ব্বনাশ! আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। না জানি কি হইবে!"

হি। কি হইয়াছে?

অ। রাজপুরী হইতে তোমার জন্য শিবিকা লইয়া দাস-দাসী আসিয়াছে। তোমাকে লইয়া যাইবে।

হি। তুমি পাগল হইয়াছ। আমাকে রাজবাড়ী হইতে লইতে আসিবে কেন?

এমন সময় রাজদূত আসিয়া প্রণাম করিল এবং কহিল যে, "রাজাধিরাজ পরমভট্টারক শ্রীমদনদেবের আজ্ঞা যে, হিরণ্ময়ী এই মুহূর্ত্তেই শিবিকারোহণে রাজাবরোধে যাইবেন।"

হিরণ্ময়ী বিস্মিতা হইলেন, কিন্তু অস্বীকার করিতে পারিলেন না। রাজাজ্ঞা অলঙ্ঘ্য। বিশেষ রাজা মদনদেবের অবরোধে যাইতে কোন শঙ্কা নাই। রাজা পরম ধার্ম্মিক এবং জিতেন্দ্রিয় বলিয়া খ্যাত। তাঁহার প্রতাপে কোন রাজপুরুষ কোন স্ত্রীলোকের উপর কোন অত্যাচার করিতে পারেন না।

হিরণ্ময়ী অমলাকে বলিলেন, "অমলে! আমি রাজদর্শনে যাইতে সম্মতা। তুমি সঙ্গে চল।"

অমলা স্বীকৃতা হইল।

তৎসমভিব্যাহারে শিবিকারোহণে হিরণ্ময়ী রাজাবরোধমধ্যে প্রবিষ্টা হইলেন। প্রতিহারী রাজাকে নিবেদন করিল যে, শ্রেষ্ঠিকন্যা আসিয়াছে। রাজাজ্ঞা পাইয়া প্রহরীর একা হিরণ্ময়ীকে রাজসমক্ষে লইয়া আসিল। অমলা বাহিরে রহিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

হিরণ্ময়ী রাজাকে দেখিয়া বিস্মিতা হইলেন! রাজা দীর্ঘাকৃতি পুরুষ; কবাটবক্ষ; দীর্ঘহস্ত; অতি সুগঠিত আকৃতি; ললাট প্রশস্ত; বিস্ফারিত আয়ত চক্ষু; শান্তমূর্ত্তি —এরূপ সুন্দর পুরুষ কদাচিত স্ত্রীলোকের নয়নপথে পড়ে। রাজাও শ্রেষ্ঠিকন্যাকে দেখিয়া জানিলেন যে, রাজাবরোধেও এরূপ সুন্দরী তুর্ল্লভ।

রাজা কহিলেন, "তুমি হিরণ্ময়ী ?"

হিরণ্ময়ী কহিলেন, "আমি আপনার দাসী।"

রাজা কহিলেন, "কেন তোমাকে ডাকিয়াছি, তাহা শুন। তোমার বিবাহের কথা মনে পড়ে ?"

হি। পড়ে।

রাজা। সেই রাত্রে আনন্দ স্বামী তোমাকে যে অঙ্গুরীয় দিয়াছিলেন, তাহা তোমার কাছে আছে ?

হি। মহারাজ! সে অঙ্গুরীয় আছে। কিন্তু সে সকল অতি গুহ্যবৃত্তান্ত, কি প্রকারে আপনি তাহা অবগত হইলেন ?

রাজা তাহার কোন উত্তর না দিয়া কহিলেন, "সে অঙ্গুরীয় কোথায় আছে ? আমাকে দেখাও ?"

হিরণ্ময়ী কহিলেন, "উহা আমি গৃহে রাখিয়া আসিয়াছি। পঞ্চবৎসর পরিপূর্ণ হইতে আরও কয়েক দণ্ড বিলম্ব আছে, অতএব তাহা পরিতে আনন্দ স্বামীর যে নিষেধ ছিল—তাহা এখনও আছে।"

রাজা। ভালই—কিন্তু সেই অঙ্গুরীর অনুরূপ দ্বিতীয় যে অঙ্গুরীয় তোমার স্বামীকে আনন্দ স্বামী দিয়াছিলেন, তাহা দেখিলে চিনিতে পারিবে?

হি। উভয় অঙ্গুরীয় একই রূপ; সুতরাং দেখিলে চিনিতে পারিব।

তখন প্রতিহারী রাজাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া এক সুবর্ণের কৌটা আনিল। রাজা তাহার মধ্য হইতে একটি অঙ্গুরীয় লইয়া বলিলেন, "দেখ, এই অঙ্গুরীয় কাহার?"

হিরণ্ময়ী অঙ্গুরীয় প্রদীপালোকে বিলক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "দেব! এই আমার স্বামীর অঙ্গুরীয় বটে, কিন্তু আপনি ইহা কোথায় পাইলেন?" পরে কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "দেব! ইহাতে জানিলাম যে, আমি বিধবা হইয়াছি। নহিলে তিনি জীবিতাবস্থায় ইহা ত্যাগ করিবার সম্ভাবনা ছিল না।"

রাজা হাসিয়া কহিলেন, "আমার কথায় বিশ্বাস কর, তুমি বিধবা নহ।"

হি। তবে আমার স্বামী আমার অপেক্ষাও দরিদ্র। ধনলোভে ইহা বিক্রয় করিয়াছেন।

রা। তোমার স্বামী ধনী ব্যক্তি।

হি। তবে আপনি বলে-ছলে-কৌশলে তাঁহার নিকট অপহরণ করিয়াছেন।

রাজা এই দুঃসাহসিক কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, "তোমার বড় সাহস, রাজা মদনদেব চোর, ইহা আর কেহ বলে না।"

হি। নচেৎ আপনি এ অঙ্গুরীয় কোথায় পাইলেন?

রা। আনন্দ স্বামী তোমার বিবাহের রাত্রে ইহা আমার অঙ্গুলিতে পরাইয়া দিয়াছেন।

হিরণ্ময়ী তখন লজ্জায় অধোমুখ হইয়া কহিলেন, "আর্য্যপুত্র! আমার অপরাধ ক্ষমা করুন, আমি চপলা, না জানিয়া কটুকথা কহিয়াছি।

নবম পরিচ্ছেদ

হিরণ্ময়ী রাজমহিষী, ইহা শুনিয়া হিরণ্ময়ী অত্যন্ত বিস্মিতা হইলেন; কিন্তু কিছুমাত্র আহ্লাদিতা হইলেন না; বরং বিষণ্ণা হইলেন। ভাবিতে লাগিলেন যে, আমি এতদিন পুরন্দরকে পাই নাই বটে, কিন্তু পরপত্নীত্বের যন্ত্রণাভোগ করি নাই।

এখন হইতে আমার সে যন্ত্রণা আরম্ভ হইল। আর আমি হৃদয়মধ্যে পুরন্দরের পত্নী—কি প্রকারে অন্যানুরাগিণী হইয়া এই মহাত্মার গৃহ কলঙ্কিত করিব ?" হিরণ্ময়ী ভাবিতেছিলেন, এমত সময়ে রাজা বলিলেন, "হিরণ্ময়ি ! তুমি আমার মহিষী বটে ; কিন্তু তোমাকে গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে আমার কয়েকটি কথা জিজ্ঞাস্য আছে। তুমি বিনা মূল্যে পুরন্দরের গৃহে বাস কর কেন ?"

হিরণ্ময়ী অধোবদন হইলেন। রাজা পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার দাসী অমলা সর্ব্বদা পুরন্দরের গৃহে যাতায়াত করে কেন ?"

হিরণ্ময়ী আরও লজ্জাবনতমুখী হইয়া রহিলেন, ভাবিতেছিলেন, "রাজা মদনদেব কি সর্ব্বজ্ঞ ?"

তখন রাজা কহিলেন, "আর একটা গুরুতর কথা আছে। তুমি পরনারী হইয়া পুরন্দর-প্রদত্ত হীরকহার গ্রহণ করিয়াছিলে কেন ?

এবার হিরণ্ময়ী কথা কহিলেন। বলিলেন, "আর্য্যপুত্র ! জানিলাম, আপনি সর্ব্বজ্ঞ নহেন। হীরকহার আমি ফিরাইয়া দিয়াছি।"

রাজা। তুমি সেই হার আমার নিকট বিক্রয় করিয়াছ। এই দেখ সেই হার।

এই বলিয়া রাজা কৌটার মধ্য হইতে হার বাহির করিয়া দেখাইলেন, হিরণ্ময়ী হীরকহার চিনিতে পারিয়া বিস্মিতা হইলেন। কহিলেন, "আর্য্যপুত্র ! এ হার কি আমি স্বয়ং আসিয়া আপনার কাছে বিক্রয় করিয়াছি ?"

রা। না, তোমার দাসী বা দূতী অমলা আসিয়া বিক্রয় করিয়াছে। তাহাকে ডাকাইব ?

হিরণ্ময়ীর অমর্ষান্বিত বদনমণ্ডলে একটু হাসি দেখা দিল। তিনি বলিলেন, "আর্য্যপুত্র, অপরাধ ক্ষমা করুন ; অমলাকে ডাকাইতে হইবে না, আমি এ বিক্রয় স্বীকার করিতেছি।"

এবার রাজা বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, "স্ত্রীলোকের চরিত্র অভাবনীয়। তুমি পরের পত্নী হইয়া পুরন্দরের নিকট কেন এ হার গ্রহণ করিলে ?"

হি। প্রণয়োপহার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি।

রাজা আরও বিস্মিত হইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি ? কি প্রকারে প্রণয়োপহার ?"

হি। আমি কুলটা। মহারাজ ! আমি আপনার গ্রহণের যোগ্য নহি। আমি প্রণাম করিতেছি, আমাকে বিদায় দিন। আমার সঙ্গে বিবাহ বিস্মৃত হউন।

হিরণ্ময়ী রাজাকে প্রণাম করিয়া গমনোদ্যত হইয়াছেন, এমন সময় রাজার বিস্ময়বিকাশক মুখকান্তি অকস্মাৎ প্রফুল্ল হইল। তিনি উচ্চৈর্হাস্য করিয়া উঠিলেন। হিরণ্ময়ী ফিরিল।

রাজা কহিলেন, "হিরণ্ময়ি! তুমিই জিতিলে, আমি হারিলাম। তুমিও কুলটা নহ, আমিও তোমার স্বামী নহি। যাইও না!"

হি। মহারাজ এ কাণ্ডটা কি, আমাকে বুঝাইয়া বলুন। আমি অতি সামান্য স্ত্রী, আমার সঙ্গে আপনার তুল্য গম্ভীরপ্রকৃতি রাজাধিরাজের রহস্য সম্ভবে না।

রাজা হাস্য ত্যাগ না করিয়া বলিলেন, "আমার ন্যায় রাজারই এইরূপ রহস্য সম্ভবে। ছয় বৎসর হইল, তুমি একখানি পত্রার্দ্ধ অলঙ্কারমধ্যে পাইয়াছিলে, তাহা কি আছে?"

হি। মহারাজ আপনি সর্ব্বজ্ঞই বটে, পত্রার্দ্ধ আমার গৃহে আছে।

রা। তুমি শিবিকারোহণে পুনশ্চ গৃহে গিয়া সেই পত্রার্দ্ধ লইয়া আইস। তুমি আসিলে আমি সকল কথা বলিব।

দশম পরিচ্ছেদ

হিরণ্ময়ী রাজার আজ্ঞায় শিবিকারোহণে স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং তথা হইতে সেই পূর্ব্ববর্ণিত পত্রার্দ্ধ লইয়া পুনশ্চ রাজসন্নিধানে আসিলেন। রাজা সেই পত্রার্দ্ধ দেখিয়া আর একখানি পত্রার্দ্ধ কৌটা হইতে বাহির করিয়া হিরণ্ময়ীকে দিলেন। বলিলেন, "উভয় অর্দ্ধকে মিলিত কর।" হিরণ্ময়ী উভয়ার্দ্ধ মিলিত করিয়া দেখিলেন, মিলিল। রাজা কহিলেন, উভয়ার্দ্ধ একত্রিত করিয়া পাঠ কর। তখন হিরণ্ময়ী নিম্নলিখিত মত পাঠ করিলেন।

(জ্যোতিষী গণনা করিয়া দেখিলাম) যে, তুমি যে কল্পনা করিয়াছ, তাহা কর্ত্তব্য নহে। (হিরণ্ময়ী তুল্য সোণার পুত্তলিকে) কখন চিরবৈধব্যে নিক্ষিপ্ত করা যাইতে পারে না। তাহার (বিবাহ হইলে ভয়ানক বিপদ্) তাহার চিরবৈধব্য ঘটিবে, গণনা দ্বারা জানিয়াছি। তবে পঞ্চবৎসর (পর্য্যন্ত পরস্পরে) যদি দম্পতি মুখদর্শন না করে, তবে এই গ্রহ হইতে যাহাতে নিষ্কৃতি (হইতে পারে,) তাহার বিধান আমি করিতে পারি।

পাঠ সমাপন হইলে, রাজা কহিলেন, "এই লিপি আনন্দ স্বামী তোমার পিতাকে লিখিয়াছিলেন।"

হি। তাহা এখন বুঝিতে পারিতেছি। কেন না, আমাদিগের বিবাহকালে নয়নাবৃত হইয়াছিল—কেনই বা গোপনে সেই অদ্ভুত বিবাহ হইয়াছিল—কেনই বা পঞ্চ বৎসর অঙ্গুরীয় ব্যবহার নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি ; কিন্তু আর ত কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।

রাজা। আর ত অবশ্য বুঝিয়াছ যে, এই পত্র পাইয়াই তোমার পিতা পুরন্দরের সহিত সম্বন্ধ রহিত করিলেন। পুরন্দর সেই দুঃখে সিংহলে গেল।

এ দিকে আনন্দ স্বামী পাত্রানুসন্ধান করিয়া একটি পাত্র স্থির করিলেন। পাত্রের কোষ্ঠী গণনা করিয়া জানিলেন যে, পাত্রটির অশীতি বৎসর পরমায়ু। তবে অষ্টাবিংশতি বৎসর বয়স অতীত হইবার পূর্ব্বে মৃত্যুর এক সম্ভাবনা ছিল। গণিয়া দেখিলেন যে, ঐ বয়স অতীত হইবার পূর্ব্বে এবং বিবাহের পঞ্চ বৎসরমধ্যে পত্নী-শয্যায় শয়ন করিয়া তাহার প্রাণত্যাগ করিবার সম্ভাবনা। কিন্তু যদি কোনরূপে পঞ্চ বৎসর জীবিত থাকেন, তবে দীর্ঘজীবী হইবেন।

অতএব পাত্রের ত্রয়োবিংশতি বৎসর অতীত হইবার সময়ে বিবাহ দেওয়া স্থির করিলেন। কিন্তু এত দিন অবিবাহিত থাকিলে পাছে তুমি কোন প্রকার চঞ্চলা হও বা গোপনে কাহাকে বিবাহ কর, এই জন্য তোমাকে ভয় দেখাইবার কারণে এই পত্রার্দ্ধ তোমার অলঙ্কারমধ্যে রাখিয়াছিলেন।

তৎপরে বিবাহ দিয়া পঞ্চ বৎসর সাক্ষাৎ না হয়, তাহার জন্য যে যে কৌশল করিয়াছিলেন, তাহা জ্ঞাত আছ। সেই জন্যই পরস্পরের পরিচয়মাত্র পাও নাই।

কিন্তু সম্প্রতি কয়েক মাস হইল, বড় গোলযোগ হইয়া উঠিয়াছিল। কয়েক মাস হইল, আনন্দ স্বামী এ নগরে আসিয়া তোমার দারিদ্র্য শুনিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলেন। তিনি তোমাকে দেখিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু সাক্ষাৎ করেন নাই। তিনি আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তোমার বিবাহ-বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক কহিলেন। পরে কহিলেন, "আমি যদি জানিতে পারিতাম যে, হিরণ্ময়ী এরূপ দারিদ্র্যাবস্থায় আছে, তাহা হইলে আমি উহা মোচন করিতাম। এক্ষণে আপনি উহার প্রতীকার করিবেন। এ বিষয়ে আমাকেই আপনার ঋণী জানিবেন। আপনার ঋণ আমি পরিশোধ করিব। সম্প্রতি আমার একটা অনুরোধ রক্ষা করিতে হইবে। হিরণ্ময়ীর স্বামী এই নগরে বাস করিতেছেন। উহাদের পরস্পর সাক্ষাৎ না হয়, ইহা আপনি দেখিবেন।" এই বলিয়া তোমার স্বামীর পরিচয়ও আমার নিকট দিলেন। সেই অবধি অমলা যে অর্থব্যয়ের দ্বারা তোমার দারিদ্র্যদুঃখ মোচন করিয়া আসিতেছে, তাহা আমা হইতে প্রাপ্ত। আমি

তোমার পিতৃগৃহ ক্রয় করিয়া তোমাকে বাস করিতে দিয়াছিলাম। হার আমি পাঠাইয়াছিলাম। সে-ও তোমার পরীক্ষার্থ।

হি। তবে আপনি এ অঙ্গুরীয় কোথায় পাইলেন? কেনই বা আমার নিকট স্বামিরূপে পরিচয় দিয়া আমাকে প্রতারিত করিয়াছিলেন? পুরন্দরের গৃহে বাস করিতেছি বলিয়া কেনই বা অনুযোগ করিতেছিলেন?

রাজা। যে দণ্ডে আমি আনন্দ স্বামীর অনুজ্ঞা পাইলাম, সেই দণ্ডেই আমি তোমার প্রহরায় লোক নিযুক্ত করিলাম। সেই দিনই অমলা দ্বারা তোমার নিকট হার পাঠাই। তার পর অদ্য পঞ্চম বৎসর পূর্ণ হইবে জানিয়া তোমার স্বামীকে ডাকাইয়া কহিলাম, 'তোমার বিবাহবৃত্তান্ত আমি সমুদয় জানি, তোমার সেই অঙ্গুরীয়টি লইয়া একাদশ দণ্ড রাত্রের সময় আসিও। তোমার স্ত্রীর সহিত মিলন হইবে।' তিনি কহিলেন যে, 'মহারাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য; কিন্তু বনিতার সহিত মিলনের আমার স্পৃহা নাই। না হইলেই ভাল হয়।' আমি কহিলাম, 'আমার আজ্ঞা।' তাহাতে তোমার স্বামী স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু কহিলেন যে, 'আমার সেই বনিতা সচ্চরিত্রা কি দুশ্চরিত্রা তাহা আপনি জানেন। যদি দুশ্চরিত্রা স্ত্রী গ্রহণ করিতে আজ্ঞা করেন, তবে আপনাকে অধর্ম্ম স্পর্শিবে।' আমি উত্তরে কহিলাম, 'অঙ্গুরীয়টি দিয়া যাও। আমি তোমার স্ত্রীর চরিত্র পরীক্ষা করিয়া গ্রহণ করিতে বলিব।' তিনি কহিলেন, এ অঙ্গুরীয় অন্যকে বিশ্বাস করিয়া দিতাম না, কিন্তু আপনাকে অবিশ্বাস নাই।' আমি অঙ্গুরীয় লইয়া তোমার যে পরীক্ষা করিয়াছি, তাহাতে তুমি জয়ী হইয়াছ।

হি। পরীক্ষা ত কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

এমন সময় রাজপুরে মঙ্গলসূচক ঘোরতর বাদ্যোদ্যম হইয়া উঠিল। রাজা কহিলেন, "রাত্রি একাদশ দণ্ড অতীত হইল—পরীক্ষার কথা পশ্চাতে বলিব। এক্ষণে তোমার স্বামী আসিয়াছেন, শুভলগ্নে তাঁহার সহিত শুভদৃষ্টি কর।"

তখন পশ্চাৎ হইতে সেই কক্ষের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল। এক জন মহাকায় পুরুষ সেই দ্বারপথে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। রাজা কহিলেন, "হিরণ্ময়ি, ইনিই তোমার স্বামী।"

হিরণ্ময়ী চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল—জাগ্রত-স্বপ্নে ভেদজ্ঞানশূন্যা হইলেন। দেখিলেন, পুরন্দর।

উভয়ে উভয়কে নিরীক্ষণ করিয়া স্তম্ভিত, উন্মত্তপ্রায় হইলেন। কেহই যেন কথা বিশ্বাস করিলেন না।

রাজা পুরন্দরকে কহিলেন, "সুহৃৎ, হিরণ্ময়ী তোমার যোগ্যা পত্নী, আদরে গৃহে লইয়া যাও। ইনি অদ্যাপি তোমার প্রতি পূর্ব্ববৎ স্নেহময়ী। আমি দিবা-রাত্র ইঁহাকে প্রহরাতে রাখিয়াছিলাম, তাহাতে বিশেষ জানি যে, ইনি অনন্যানুরাগিণী। তোমার ইচ্ছাক্রমে উঁহার পরীক্ষা করিয়াছি, আমি উঁহার স্বামী বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলাম, কিন্তু রাজ্যলোভেও হিরণ্ময়ী লুব্ধ হইয়া তোমাকে ভুলেন নাই। আপনাকে হিরণ্ময়ীর স্বামী বলিয়া পরিচিত করিয়া ইঙ্গিতে জানাইলাম যে, হিরণ্ময়ীকে তোমার প্রতি অসৎ প্রণয়াসক্ত বলিয়া সন্দেহ করি। যদি হিরণ্ময়ী তাহাতে দুঃখিত হইত, 'আমি নির্দ্দোষী, আমাকে গ্রহণ করুন' বলিয়া কাতর হইত, তাহা হইলে বুঝিতাম যে, হিরণ্ময়ী তোমাকে ভুলিয়াছে। কিন্তু হিরণ্ময়ী তাহা না বলিয়া বলিল, 'মহারাজ, আমি কুলটা, আমাকে ত্যাগ করুন।' হিরণ্ময়ি! তোমার তখনকার মনের ভাব আমি সকলই বুঝিয়াছিলাম। তুমি অন্য স্বামীর সংসর্গ করিবে না বলিয়াই আপনাকে কুলটা বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলে। এক্ষণে আশীর্ব্বাদ করি, তোমরা সুখী হও।"

হি। মহারাজ! আমাকে আর একটি কথা বুঝাইয়া দিন। ইনি সিংহলে ছিলেন, কাশীতে আমার সঙ্গে পরিচয় হইল কি প্রকারে? যদি ইনি সিংহল হইতে সে সময় আসিয়াছিলেন, তবে আমরা কেহ জানিলাম না কেন?

রাজা। আনন্দ স্বামী এবং পুরন্দরের পিতায় পরামর্শ করিয়া, সিংহলে লোক পাঠাইয়া উঁহাকে সিংহল হইতে একেবারে কাশী লইয়া গিয়াছিলেন, পরে সেখান হইতে ইনি পুনশ্চ সিংহল গিয়াছিলেন, তাম্রলিপ্তে আসেন নাই, এ জন্য তোমরা কেহ জানিতে পার নাই।

পুরন্দর কহিলেন, "মহারাজ! আপনি যেমন আমার চিরকালের মনোরথ পূর্ণ করিলেন, জগদীশ্বর এমনই আপনার সকল মনোরথ পূর্ণ করুন। অদ্য আমি যেমন সুখী হইলাম, এমন সুখী কেহ আপনার রাজ্যে কখন বাস করে নাই।"

সমাপ্ত

: আমাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সাহিত্য :

অহিংস বিপ্লব—আচার্য্য জে. বি. কৃপালনী ... ॥০

গান্ধীবাদের পুনর্বিচার—এন. এম. দান্তওয়ালা ... ৸০

স্বাধীন ভারতের অর্থনৈতিক সংগঠন—
কস্তুরচাঁদ লালুয়ানি ও ধীরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ... ৪৲

জাতীয় পতাকা—সুখেন্দু দাশগুপ্ত ... ১৲

গ্রামে ও পথে—রতনমণি চট্টোপাধ্যায় ... ২৲

: আমাদের নাটক ও গল্প :

দুয়ে দুয়ে বাইশ (নাটক)—ঋষিদাস ... ২৲

মহাভিক্ষু (নাটক)—প্রভাসচন্দ্র ঘোষ ... ২৲

মহাকাল (নাটক)—ধীরেন্দ্রলাল ধর ... ৸০

নন্দকুমার—প্রবোধ সরকার ... ৸০

কালের যাত্রা (গল্প)—জ্যোতিষ দাশগুপ্ত ... ২॥০

কঙ্কাবতী—ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদক : বিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য

: আমাদের বঙ্কিম-সাহিত্য (পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ) :

কপালকুণ্ডলা—ভূমিকা : ডক্টর সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ... ১৲

আনন্দমঠ—ভূমিকা : অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন ... ১৲

দেবী চৌধুরাণী—ভূমিকা : ডক্টর বিজন বিহারী ভট্টাচার্য্য ... ১৲

বিষবৃক্ষ—ভূমিকা : ডক্টর মণীন্দ্রমোহন বসু ... ১৲

চন্দ্রশেখর—ভূমিকা : অধ্যাপক কালীপদ সেন ... ১৲

মৃণালিনী—ভূমিকা : ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ... ১৲

রাজসিংহ—ভূমিকা : ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার ... ১৲

সীতারাম—ভূমিকা : সজনীকান্ত দাস ... ১৲

দুর্গেশনন্দিনী—ভূমিকা : ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ... ১৲

রজনী—ভূমিকা : শ্রীরাধারাণী দেবী ... ১৲

ইন্দিরা—ভূমিকা : অধ্যাপক জনার্দ্দন চক্রবর্ত্তী ... ১৲

রাধারাণী ও যুগলাঙ্গুরীয়—ভূমিকা : বিশেশ্বর কালিদাস রায় ... ১৲

কৃষ্ণকান্তের উইল—ভূমিকা : শ্রীযুত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ... ১৲

: আমাদের শিক্ষানীতির বই :

EDUCATION IN MODERN INDIA : A Brief Review : 4-0-0
Prof. ANATHNATH BASU, M. A. (Lond.),

বুনিয়াদী শিক্ষার কথা—শ্রীঅনিলমোহন গুপ্ত এম.এ. ২৲

বুনিয়াদী শিক্ষা পদ্ধতি—শ্রীঅনিলমোহন গুপ্ত এম.এ. ২৲

প্রাথমিক শিক্ষাদান পদ্ধতি——
শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার ও শ্রীপ্রিয়নাথ গুপ্ত এম.এ. বি-টি. ২৲